BHATER GANDHA

by

PRAFULLA ROY

Karuna Prakashani
18A, Tamer Lane
Calcutta 700009

ভাতের গন্ধ

প্রফুল্ল রায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

মুদ্রাকর

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রিন্টার্স

১৩৮ বিধান সরণী

কলকাতা-৪

মা ও বাবা

শ্রীচরণেষু
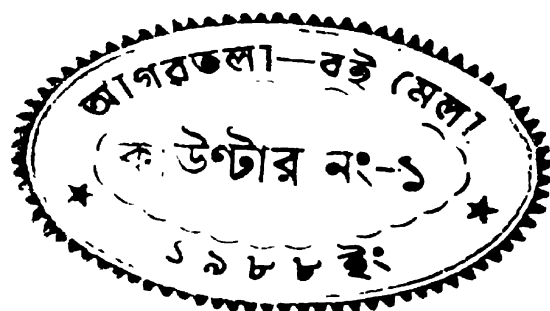
এই লেখকের অন্যান্য বই :

আকাশের নীচে মানুষ

মহাযুদ্ধের ঘোড়া ১/২

আমাকে দেখুন ১/২/৩

নোনা জল মিঠে মাটি

সিন্ধুপারের পাখি

প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

সাতঘরিয়া ও অন্যান্য গল্প

শঙ্খিনী

পূর্বপার্বতী

সীমারেখা মুছে যায়

বাঘবন্দী

সেনাপতি নিরুদ্দেশ

কাবুল আর টাবুল

তিনমূর্তির কীর্তি

শীর্ষবিন্দু ইত্যাদি

ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা কাঁচা সড়ক চলে গেছে। এদেশে বলে 'কাচ্চী'। গোটা কাচ্চী জুড়ে গভীর আঁচড়ের মতো একটানা এলোপাথাড়ি গর্ত। বারো মাস এই রাস্তায় বয়েল আর ভৈসা গাড়ি চলে। এগুলো তারই দাগ।

দু ধারে মাইলের পর মাইল পাথর-মেশানো পড়তি ভূমি। যতদূর তাকানো যায় কোথাও একটা ধানের শীষ চোখে পড়ে না। তবে শস্যহীন নিষ্ফলা কর্কশ মাটি ফাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে সর্বন ঘাস, সাবুই ঘাস, শরের ঝোপ। সর্বন পাতার সুঘ্রাণ হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। এখানে ওখানে ফুটে আছে থোকায় থোকায় সফেদিয়া আর মনরঙ্গোলি ফুল। এই সব আগাছা আর ফুলের জীবনীশক্তি বড় প্রবল। নইলে রুক্ষ পাথুরে মাটির রস শুষে টিকে আছে কি করে?

কাঁচা মেঠো রাস্তায় হাঁটুভর লালচে ধুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে ধানোয়ার। বয়েস চল্লিশ বেয়াল্লিশ। বাজপড়া ঢ্যাঙা তালগাছের মতো চেহারা। দুব্‌লা কমজোরি শরীরে মাংস বলতে বিশেষ কিছু নেই; সবই প্রায় হাড়। রোদে জ্বলে জ্বলে গায়ের রঙ তামাটে। ফাটা পা, খসখসে চামড়া থেকে খই উড়ছে। মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি। পরনে তালিমারা চিটচিটে খাটো ধুতি আর বহুকালের পুরনো জামা। কাঁধে একটা ঝুলি। তার ভেতর রয়েছে ধানোয়ারের যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি—বাঁদরার ছাই (একরকম ক্ষার) দিয়ে কাচা দুটো কাপড়, দুটো জামা, একটা ধুসো কম্বল, কিছু বাজরার ছাতু, খানিক মকাই, সুথনি (এক ধরনের কন্দ), সিলভারের তোবড়ানো একটা থালা, পেতলের লোটা, ধারাল দা আর একটা টাঙ্গি। বছর দুই আগে এক আদিবাসী মুণ্ডার কাছ থেকে আড়াই টাকায় টাঙ্গিটা

কিনেছিল ধানোয়ার। সেটার ঝকঝকে ফলা ঝুলির বাইরে বেরিয়ে আছে।

ধানোয়ার জাতে গঞ্জু অর্থাৎ জল-অচল অচ্ছুৎ। তার বাপ, নানা, নানার বাপ, নানার বাপের বাপ--আগের চার পাঁচ পুরুষ ছিল ভূমিদাস। অন্যের জমিতে তাদের আমৃত্যু বেগার দিতে হয়েছে। তবে ধানোয়ার স্বাধীন মানুষ। তাকে কারো জমিতে কামিয়াগিরি করতে বা বেগার দিতে হয় না।

এই বিশাল পৃথিবীতে কেউ নেই তার। কোন ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে গেছে তা ভালো করে মনেও নেই। ধানোয়ার তার মা-বাপের একমাত্র ছৌয়া। না আছে তার একটা ভাই, না একটা বোন। শুধু তাই না, একটা স্থায়ী আস্তানা পর্যন্ত নেই।

মা-বাপের মৃত্যুর পর থেকে কাজ আর খাদ্যের খোঁজে অনবরত ছুটে বেড়াচ্ছে ধানোয়ার। তার নির্দিষ্ট কোন কাজও নেই। বেঁচে থাকার জন্য তার হাজার রকমের উঞ্ছবৃত্তি। কখনও আরা জেলায় গিয়ে ঠিকাদারদের কাছে মাটি কেটে সড়ক বানিয়েছে সে। কখনও রাঁচী গিয়ে জঙ্গলকাটাইদের দলে ভিড়ে বিশাল বিশাল গাছের গায়ে কুড়ুল চালিয়েছে। কখনও শিকারীদের সঙ্গে কোশীর ধারের 'ফরিসে' (ফরেস্ট) চলে গেছে। সেখানে সে জঙ্গলহাঁকোয়া। টিন পিটিয়ে হল্লা করে বনের হিংস্র জানোয়ারদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে শিকারীদের বন্দুকের পাল্লার ভেতর এনে দিয়েছে। কখনও মুসহরদের মতো ক্ষেতমজুরের কাজ নিয়ে চলে গেছে মতিহারীতে। যখন কোন কাজ মিলত না তখন পূর্ণিয়ার জঙ্গলে পাখি মেরে ঠিকাদারদের কাছে বেচেছে। যেখানে কাজ এবং পেটের দানা, সেখানেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেছে সে।

চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে ধানোয়ার যত হাজার মাইল হেঁটেছে পৃথিবীর সেরা ভূ-পর্যটকও বোধহয় তা পারে নি।

কিন্তু তিন চার সাল আগে ভারী 'বোখারে' পড়ল সে। ধুম জ্বর, সেই সঙ্গে রক্তবমি। তখন সে যে ঠিকাদারবাবুদের কাছে কাজ করত

তারাই তাকে 'অসপাতালে' ভর্তি করে দিয়েছিল। দু মাস পর যখন ছাড়া পেল, শরীরে আর কিছু নেই; বেজায় কমজোরি হয়ে গেল সে। তারপর থেকে একনাগাড়ে কাজ করতে পারে না ধানোয়ার। দু রোজ খাটলে দশ রোজ শুয়ে থাকতে হয়।

তার থাকারও ঠিক ঠিকানা নেই। আজ কোন হাটের চালায়, কাল কোন গাছের নিচে, পরশু হয়ত কারো বাড়ির বারান্দায়। তরশু বা নরশু সড়কের ধারের খোলা মাঠে। জীবন এইভাবেই কেটে যাচ্ছে তার।

ধানোয়ার এখন আসছে সুদূর উত্তর থেকে; যাবে দক্ষিণে। যেখান থেকে সে আসছে সেখানে এ বছর আদৌ বৃষ্টি হয়নি। ফলে ক্ষেতির পর ক্ষেতি জ্বলে গেছে। মারাত্মক খরায় এক দানা ধানও সেখানে ফলে নি।

গত এক মাসের মধ্যে একদিনও ভাত খায় নি ধানোয়ার। খাওয়া দূরের কথা, চোখে দ্যাখে নি পর্যন্ত। স্রেফ বাজরা, মকাই কি সুথনি খেয়ে আছে। সে শুনেছে দক্ষিণে এ বছর প্রচুর ধান হয়েছে। তার বড় আশা, ওখানে গেলে দু মুঠো ভাত খেতে পাবে।

উত্তর থেকে ধানোয়ার রওনা হয়েছিল দিন চারেক আগে। এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট, গাঁ-গঞ্জ, হাট-বাজার, সব তার মুখস্থ। সে জানে বিকেলের মধ্যে সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে সোনালী ধানে মাঠের পর মাঠ আলো হয়ে আছে।

দুপুরের আর বেশি দেরি নেই। সুরয ক্রমশ আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে মাথার ওপর উঠে আসছে।

সবে শীতের শুরু। কিন্তু এর মধ্যেই বিহারের এই প্রান্তে হাওয়ায় দূর হিমের কণা মিশে গেছে। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস এত বেলাতেও গায়ের চামড়ায় ছুরির মতো কেটে কেটে বসতে থাকে।

জোরে জোরে পা চালায় ধানোয়ার। যত এগোয় ততই যেন চোখের সামনে সফেদিয়া ফুলের মতো রাশি রাশি ভাত ফুটে ওঠে।

গরম ভাতের সুগন্ধ নাকের ভেতর দিয়ে শরীরের শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে যেতে থাকে। হো রামজী, কত কাল সে ভাত খায় নি।

ঠিক দুপুরে, সূর্যটা যখন খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে সেই সময় মাঠ ফুরিয়ে গেল। ভাঙাচোর কাঁচা রাস্তা থেকে 'পাক্কী'তে উঠে আসে ধানোয়ার। পাক্কী অর্থাৎ পাকা সড়ক। এটা ধরে আরো কয়েক ঘণ্টা হাঁটতে হবে। ধানোয়ার একবার ভাবে—থামবে না, বরাবর হেঁটে যাবে। কিন্তু তখনই খেয়াল হয়, দুব্‌লা অশক্ত শরীর একেবারে ভেঙে আসছে। এখন খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া দরকার। তা ছাড়া পেটের ভুখটাও অনবরত 'সুই' (ছুঁচ) বিঁধিয়ে যাচ্ছে। এখন কিছু না খেলে ধানের ক্ষেতি পর্যন্ত হেঁটে যাবার মতো তাকত থাকবে না।

এদিক সেদিক তাকাতেই ধানোয়ারের চোখে পড়ে, বাঁ ধারের ঝাঁকড়া-মাথা পীপর গাছগুলোর তলায় অনেক লোক বসে আছে। পুরুষ আওরত বাচ্চাকাচ্চা মিশিয়ে প্রায় পঞ্চাশ জন। ধানোয়ার আস্তে আস্তে সেখানে চলে যায় এবং ওদের কাছাকাছি ঘাসের জমিতে কাঁধের ঝুলিটা নামিয়ে বসে পড়ে।

মাঠের মাঝখানে সেই কাঁচা রাস্তাটা ছিল নির্জন; ক্বচিৎ কখনো এক-আধটা বয়েল কি ভৈসা গাড়ি পাশ দিয়ে ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ তুলে হেলে দুলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু পাক্কীর ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো। উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে ট্রাক, দূর পাল্লার বাস, লৌরি, সাইকেল রিকশা, বয়েল বা ভৈসা গাড়ি চলেছে অবিরাম। তা ছাড়া মানুষের চলাচল তো আছেই।

রাস্তার দিকে চোখ নেই ধানোয়ারের। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে পীপর গাছের তলার মানুষগুলোকে সে দেখতে থাকে। এক নজরেই টের পাওয়া যায় ওরাও তারই মতো ভুখা। আধনাঙ্গা হাভাতের দল। এই দুপুরবেলা পুঁটলি-পোঁটলা, ঝোলা-টোলা বা গামছা কি ধুতির খুঁট খুলে বাসি লিট্টি, বাজরার রুটি কি ছাতু বার করে সবাই খাচ্ছে।

এত মানুষের ভেতর সব চাইতে বেশি করে যারা চোখে পড়ছে তারা হলো দু'জন আওরত। একজনের বয়স কম ; তিরিশের নিচেই হবে। হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড় এবং শক্ত গড়নের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায় তার গায়ে প্রচুর তাকত। ছমকী লড়কী না হলেও তার চেহারায় কিছু ছিরিছাঁদ রয়েছে। নাকটা যদিও বেঢপ মোটা, ঠোঁট দুটো পুরু, তবু চোখ বেশ টানা। মাথায় অঢেল চুল, তবে তাতে জন্মের পর থেকে খুব সম্ভব তেল পড়ে নি। লাল ধুলোয় সেগুলো তামাটে রুক্ষ এবং জটপাকানো। পরনে খাটো শাড়ি আর জামা। কানে ঝুটো পাথর বসানো চাঁদির করণফুল ছাড়া সারা গায়ে তার কোন জেবর বা সাজের জিনিস নেই।

অন্য আওরতটার বয়েস যে কত, তার হিসেব নেই। সত্তর হতে পারে, আশী হতে পারে. এক শো হলেও কারো কিছু বলার নেই। লিকলিকে ঘাড়, বুড়ো গিধের মতো চেহারা। মাথার চুলগুলো পাটের ফেঁসো হয়ে উঠেছে। সারা গায়ের চামড়া কুঁচকে ফেটে ফেটে গেছে। ঘোলাটে চোখ। দুই মাড়িতে চার পাঁচটার বেশী দাঁত নেই।

অল্পবয়সী আওরতটা ময়লা গামছার খুঁটে মকাইয়ের ছাতু গুলে ছোট ডেলা পাকিয়ে বুড়ীর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, 'খা লে—'

বুড়ী অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে মাথা ঝাঁকায়, 'নায় নায় নায় খায়েগী। ভাত দে। গরম ভাত্তা না থাকলে পানিভাত্তা দে।'

'কোথায় পাব ভাত? ভাতের জায়গায় কি আমরা এসেছি? সেখানে গেলে খাওয়াব। এখন ছাতু খা।'

'নায়। ভাত খাওয়াবি বলে এক মাহিনা ধরে আমাকে হাঁটাচ্ছিস।'

'এক মাহিনা কঁহা, দশগো রোজ। লে, খা—'

অবুঝ বাচ্চার মতো মাথা ঝাকিয়ে যায় বুড়ী, 'দেড় দো সাল ভাত খাই না। মকাই আর সুথনি খাইয়ে তুই আমাকে খতম করে দিবি।'

ওদের কথা শুনতে শুনতে ঝুলি থেকে বাসি লিট্টি বার করে চিবোতে থাকে ধানোয়ার।

ওদিকে কমবয়সী আওরতটা বুড়ীকে বলে, 'দেড় দো সাল কী বলছিস! এই তো বিশ রোজ আগে এক বাড়ি থেকে পানিভাত্তা চোরি করে তোকে খাওয়ালাম।'

বুড়ী দুর্বোধ্য গলায় চেঁচায়, 'ঝটফুস (বাজে কথা)! বিশ রোজ নহীঁ, দেড় দো সাল।'

'ঠিক আছে, দেড় দো সাল তুই ভাত খাস নি। আভি ছাতুয়া খা লে। সেই ধানের ক্ষেতিগুলোতে আগে যাই; কত ভাত খেতে পারিস দেখব।' বুঝিয়ে সুঝিয়ে বুড়ীর মুখে মকাইয়ের ডেলা পুরে দেয় আওরতটা।

আর লিট্টি চিবোতে চিবোতে চমকে ওঠে ধানোয়ার। ওরাও তা হলে তারই মতো ভাতের খোঁজে দক্ষিণে ধানের রাজ্যে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর লিট্টি খাওয়া হয়ে গেলে এধারে ওধারে তাকায় ধানোয়ার। খিদের ঝোঁকে খেতে শুরু করেছিল সে; জলের কথা ভাবে নি। এখন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। একটু জল না পাওয়া গেলে লিট্টির ডেলাগুলোকে নিচের দিকে নামানো যাচ্ছে না। কিন্তু আশেপাশে না আছে একটা কুয়ো, না একটা 'টিপকল' (টিউবওয়েল)।

আচমকা ডান দিক থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'কা, পানি চাই?'

মুখ ফিরিয়ে ধানোয়ার দেখে একটা আধবুড়ো লোক তারই দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা তা হলে তার ওপর আগাগোড়া নজর রেখেছে এবং তার যে জলের দরকার বুঝতে পেরেছে। সে আস্তে ঘাড় কাত করে, বলে, 'হাঁ—'

লোকটার কাছে একটা বড় লোটায় জল আছে। সে শুধোয়, 'পানি কীসে নেবে?'

ঝুলি হাতড়ে ব্যস্তভাবে নিজের লোটা বার করে ধানোয়ার।

লোকটা জল ঢেলে দেয়। এক নিশ্বাসে লোটা ফাঁকা করে ধানোয়ার বলে, 'বঁচ গিয়া। তুমি পানিয়া না দিলে বিলকুল মরে যেতাম।' কৃতজ্ঞ চোখে সে আধবুড়ো লোকটার দিকে তাকায়।

জবাব না দিয়ে লোকটা শুধোয়, 'কোত্থেকে আসছ ?'

সোজা উত্তর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় ধানোয়ার, 'উধারসে। তুমি ?'

লোকটা পশ্চিম দিগন্তের দিকে আঙুল দেখায় 'উহাসে।' তারপর জিজ্ঞেস করে, 'যাবে কোথায় ?'

এবার দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দেয় ধানোয়ার।

লোকটার কপাল কুঁচকে যায়। বলে, 'ও দিকে কেন ? কোন কাজে যাচ্ছ ?'

ধানোয়ার তার উদ্দেশ্য জানিয়ে দেয়।

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'হো রামজী, হো বিষুণজী, আমিও ভাতের তালাশেই ঐদিকে যাচ্ছি। পুরো দো মাহিনা ভাত খাই নি।'

ভেতরে ভেতরে কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে ধানোয়ার। পীপর গাছের তলায় অন্য লোকদের দেখিয়ে বলে, 'আর ওরা ?'

লোকটা জানায়, বাকী পঞ্চাশ জন পুরুষ আওরত বাচ্চাকাচ্চাও ভাতের খোঁজেই দক্ষিণে চলেছে।

এত লোক ভাগীদার হলে বড়ই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। ধানোয়ার বলে, 'এই আদমীরা কি তোমার গাঁওবালা (গাঁয়ের লোক) ?'

'নহী।' লোকটা জানায় সে ঝাড়া হাত-পা একলা মানুষ। বাকী লোকজনেরা কেউ এসেছে পশ্চিম থেকে, কেউ পুব থেকে, কেউ বা ধানোয়ারের মতোই খাড়া উত্তর থেকে। পথে আসতে আসতে ওদের সঙ্গে জানপয়চান হয়েছে।

কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে ধানোয়ার। তারপর বলে, 'তুমি কি জানো, আরো মানুষ ওদিকে ভাতের তালাশে গেছে কিনা ?'

'হো সাকতা। যেখানে পেটের দানা মিলবে সেখানে মানুষ তো যাবেই।'

এত মানুষ যদি একই দিকে ধাওয়া করে যায়, তা হলে ভাগে ক'টা ভাতের দানা আর পড়বে? বড় আশা নিয়ে পুরা চার রোজ হেঁটে ধানোয়ার এই দক্ষিণে এসেছে। ভেবেছিল, ধান ওঠার এই মরসুমে বড় বড় ক্ষেতিবালাদের মেজাজ যখন ভালো থাকে, মন দরাজ হয়ে যায় তখন ক'টা দিন পেট ভরে খাওয়ার ভরসা থাকে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সব আশাই বিলকুল চৌপট। হঠাৎ ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়ে সে।

॥ দুই ॥

দেখতে দেখতে সূর্যটা মাথার ওপর থেকে পছিমা আকাশের দিকে নামতে শুরু করে। রোদের তাপ এবং জেল্লা কমতে থাকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই আধবুড়ো লোকটা হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পৌঁটলাপুঁটলি বেঁধে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আর বসে থাকা যাবে না। অন্ধেরা নামবার আগে ধানের ক্ষেতিগুলোতে পৌঁছুতে হবে।' ধানোয়ারকে শুধোয়, 'কা, তুমনি যাওগে?'

ধানোয়ার ওদের অনেক পরে পীপর গাছের তলায় এসেছে। এই মুহূর্তে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। সে ঠিক করে ফেলে আরো কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবে। বলে, 'তোমরা এগোও; আমি পরে আসছি।'

আধবুড়ো লোকটার দেখাদেখি অন্য সবাই ঝোলাটোলা বাঁধাছাঁধা করে উঠে পড়ে। মুহূর্তে পীপর গাছগুলোর তলা ফাঁকা হয়ে যায়।

বেশ খানিকক্ষণ পর কাঁধে ঝুলি ফেলে উঠে দাঁড়ায় ধানোয়ার। পাক্কীর দিকে পা বাড়াতে যাবে, কেউ পেছন থেকে আচমকা ডেকে ওঠে, 'এ আদমী—'

চমকে ঘাড় ফেরায় ধানোয়ার। সেই বুড়ী আর অল্পবয়সী আওরতটা। ধানোয়ার ভেবেছিল, সবাই চলে গেছে। কিন্তু মেয়েমানুষ দুটো যে এখনও বসে আছে, সে খেয়াল করেনি। জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবে?'

'হাঁ।' কমবয়সী আওরতটা ঘাড় হেলায়।

'কা?'

'ঐ বুড়হাটার সাথ যখন কথা বলছিলে তখন শুনলাম তুমিও ভাতের তালাশে চলেছ।'

বুড়ীকে খাওয়াতে খাওয়াতে আওরতটা তা হলে তার দিকে কান রেখেছিল। ধানোয়ার বলে, 'হাঁ।'

আওরতটা বলে, 'আমরাও যাচ্ছি।'

না বললেও চলত। ধানোয়ার আগেই আধবুড়ো লোকটার মুখে শুনেছে। সে বলে, 'তোমরা ওদের সাথ গেলে না?'

'হামনিলোগ ওই আদমীগুলোর সাথ আসিনি।'

'তব্?'

এবার আওরতটা যা বলে তা এইরকম। আগে থেকেই তারা এসে এই পীপর গাছগুলোর তলায় বসেছিল। পরে নানা দিক থেকে অন্য লোকেরা আসে। ওদের সঙ্গেই দক্ষিণে ধানের দেশে যাওয়া যেত কিন্তু মকাইয়ের ছাতু খাওয়ার পর তার সঙ্গিনী বুড়ীটার বুকে বেজায় টান ওঠে। তাই আর যাওয়া হয় নি। এখন অবশ্য টানটা অনেক কমেছে।

এ সব ধানাইপানাই শোনার আগ্রহ আদৌ নেই ধানোয়ারের। 'বকোয়াস' কোনকালেই সে পছন্দ করে না। কৌতূহলশূন্য গলায় সে বলে, 'রুখে দিলে কেন? কোই জরুরত হ্যায়?'

'হাঁ—'

আওরতটা এবার কাজের কথা পাড়ে। প্রাচীন গিধের মতো বুড়ীটাকে নিয়ে সে বহোত বিপদে পড়েছে। ভাতের সন্ধানে তারা

দিন দশেক ধরে সমানে হাঁটছে। কিন্তু বুড়ীটা বড়ই দুব্‌লা, রুগ্ন আর 'বীমারী'। একা একা তাকে নিয়ে সামনের এতটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে দক্ষিণের ধানক্ষেতে যেতে সাহস হচ্ছে না। ধানোয়ার যখন ওদিকেই যাচ্ছে—যদি তাদের সঙ্গে থাকে, আওরতটা ভরসা পায়।

একটু ভেবে ধানোয়ার জানায়, তার আপত্তি নেই। তৎক্ষণাৎ কাঁধে ঝোলাঝুলি ফেলে বুড়ীকে নিয়ে মেয়েমানুষটা উঠে দাঁড়ায়। তারপর একসঙ্গে তিনজন পীপর গাছের তলা থেকে রওনা হয়ে যায়।

মাঝখান দিয়ে বাঁধানো সড়ক। দু পাশে খানিকটা করে জায়গায় পীচ পড়ে নি; সেখানে ঘাস গজিয়ে আছে। লোকজন ঐ ঘাসের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। দু ধারেই পাক্কীর তলায় নয়ানজুলি, বর্ষায় ডুবে গিয়েছিল। এখন এই শীতে জল অনেকটা শুকিয়ে কাদা থকথক করছে।

পাকা সড়কের ধারে ঘাসের রাস্তা দিয়ে ধানোয়াররা এগিয়ে চলেছে। মাঝখানে বুড়ী, এক পাশে অল্পবয়সী আওরতটা, আরেক পাশে ধানোয়ার।

বুড়ীর জন্য ধানোয়ার আর আওরতটা জোরে পা ফেলতে পারছে না। আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছে। গা ঘেঁষে একেকটা ভারী ট্রাক এবং সাহারসা বা পাটনাগামী দূর পাল্লার বাস ঝড় বইয়ে ছুটে যাচ্ছে।

চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য এত যুদ্ধ করতে হয়েছে ধানোয়ারকে যে অন্য কোন দিকে চোখ ফেরাবার সময় পায় নি। জগতের কোন ব্যাপারেই তার বিশেষ আগ্রহ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে আশ্চর্য দুঃসাহসিক এক অভিযানে যেতে যেতে দুই অচেনা সঙ্গিনী সম্পর্কে সামান্য কৌতূহল বোধ করতে থাকে সে।

চোখের তারাদুটোকে কোণের দিকে এনে আড়ে আড়ে সঙ্গিনীদের, বিশেষ করে কমবয়সী আওরতটার দিকে তাকায় ধানোয়ার। তাজ্জবকী বাত, আওরতটাও তাকে একইভাবে লক্ষ্য

করছে। বোঝা যায়, অজানা 'পুরুখ' সঙ্গীটি সম্পর্কে তার অনন্ত কৌতূহল।

খানিকক্ষণ চলার পর হঠাৎ ধানোয়ার শুধোয়, 'তুমলোগ কঁহাসে আতী হ্যায় ?'

আওরতটা বলে, 'গাঁও জনকপুরা—'

'কঁহা ?'

'কোশী নদীকা নাম শুনা কভী ?'

'জরুর।'

'তার পাড়ে।'

কী চিন্তা করে ধানোয়ার শুধোয়, 'ভাতের তালাশে বেরিয়ে পড়েছ যে ? ওদিকে এবার ধান হয় নি—কা ?'

আওরতটা মাথা নাড়ে, 'নহী। এহী সাল উধরি বহোত ভারী বাড় (বন্যা) হুয়া। ক্ষেতিউতি দশ হাত পানির তলায় ডুবে গিয়েছিল। ধান হবে কী করে ?'

ধানোয়ার ভাবে, তাদের ওদিকে 'বারিষ' না হওয়ায় ফসল হয় নি ; আর আওরতটার গাঁয়ে কুশীর বান এক দানা ধানও জন্মাতে দেয় নি। মাথা নেড়ে বিষণ্ণ মুখে সে বলে, 'দুখকী বাত—'

একটু চুপ।

তারপর ধানোয়ারই ফের শুরু করে, 'তুজনে বেরিয়ে পড়েছ। তুমনিলোগনকা আউর আদমী কঁহা ?' অর্থাৎ আওরতদের সংসারের অন্য লোকজন সম্পর্কে জানতে চাইছে সে।

মেয়েমানুষটা বলে, 'আউর কোই নহী হামনিলোগনকা।'

'এ বুড়হী তোমার কে লাগে—মাঈ ?'

'নায়, সাস (শাশুড়ী)।'

'তুমনিকো মরদ কঁহা ?'

আওরতটা জানায়, তিন সাল আগে দশ দিনের জ্বরে তার মরদ মরে গেছে।

এই সময় বুড়ীটা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ভাঙা জড়ানো গলায় কী বলতে থাকে. পরিষ্কার বোঝা যায় না। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থাকার পর যেটুকু ধরা যায় তা হল, বুড়ীর অত বড় জোয়ান বলশালী ছেলেটা মরে যাওয়ায় কষ্টের আর শেষ নেই তাদের। সে বেঁচে থাকতে দিনরাত খেটে খুটে কামাই করে এনে খাওয়াত। কিন্তু এখন ছু টুকরো রুটি বা ক'টা ভাতের দানার জন্য তারা সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘ্যানঘেনে 'বারিষে'র মতো বুড়ীর একটানা বিলাপ শুনতে শুনতে একটু দুঃখই হয় ধানোয়ারের। অনেকক্ষণ পর বুড়ীর ফোঁপানি থামলে কমবয়সী আওরতটার দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'তুমি তা হলে—'

তার কথা বুঝে নিয়ে আওরতটা বাকীটুকু পূরণ করে দেয়, 'রাণ্ডী (বিধবা) '

কথায় কথায় সে আরো জানায়, জাতে তারা দোসাদ—জল-অচল অচ্ছুৎ। তাদের জাতে স্বামী মরবার পর কোন আওরত বসে থাকে না, আবার চুমৌনা (সাঙা) করে নতুন মরদের ঘর করতে যায়। লেকেন এই আওরতটা একঘরিয়া হয়েই আছে

একঘরিয়া হল—যে মেয়েমানুষ মাত্র একজন 'পুরুখে'র ঘর করেছে। ধানোয়ার জানে গঞ্জু কোয়েরি দোসাদ ধোবী মুসহর—এমনি সব জাতের মেয়েদের অনেকেই দোঘরিয়া চারঘরিয়া ছেঘরিয়া সাতঘরিয়া পর্যন্ত হয়। অর্থাৎ স্বামী মরে গেলে বা অন্য কারণে সাদি টুটে গেলে দু'বার চারবার ছ'বার সাতবার পর্যন্ত কেউ কেউ চুমৌনা করে।

ধানোয়ার শুধোয়. 'তুমি বামহন কায়াথ (ব্রাহ্মণ-কায়স্থ) আওরতদের মতো একঘরিয়া হয়ে রইলে যে ? নয়া মরদ জুটল না ?'

মেয়েমানুষটার অহঙ্কারে একটু ঘা লাগে যেন। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, 'কেত্তে কেত্তে পুরুখ চুমৌনা করে নয়া সম্‌সার পাতবার জন্যে আমার পা ধরে সেধেছে।'

লিকলিকে সরু গলার ওপর মাথাটা আস্তে আস্তে নাড়তে নাড়তে দু'জনের মাঝখান থেকে বুড়ীটা আচমকা বলে ওঠে, 'ও ঠিক বাত ' সে আরো জানায় তার রাণ্ডী পুতহুকে (বিধবা ছেলের বউ) চুমৌনা করার জন্য 'বহোতসে আদমী' তাকেও ধরেছিল।

ধানোয়ার বুড়ীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার আওরতটার দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, 'তবে চুমৌনা করলে না কেন?'

আওরতটা বলে, 'আমার সাসকে (শাশুড়ীকে) পুছে দেখ না।'

বুড়ীকে জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলে ওঠে. 'চুমৌনা হলে বহু (বউ) তো পরের ঘরে চলে যেত। হামনিকো ওর সাথ নয়া সসুরালে নিত না, কভী নায়।'

সত্যিই তো, নয়া মরদ স্ত্রীর সঙ্গে তার আগের পক্ষের সাসকে কেন নিয়ে যাবে! ধানোয়ার বলে, 'ঠিক বাত।'

'ও চুমৌনা করে চলে গেলে আমার কী হবে? হামনি বুড়হী, কমজোর, বীমারী। কৌন খিলায়গা হামনিকো, কৌন দেখভাল করেগা? ও চলে গেলে মরে যাব। জরুর ভুখা মর যায়েগী।'

মেয়েমানুষটা সম্পর্কে রীতিমত শ্রদ্ধাই হয় ধানোয়ারের। মৃত স্বামীর বুড়ী মায়ের জন্য এতটা কেউ করে না। সে বলে, 'অব সমঝ গিয়া—'

আওরতটা বলে. 'এই বুড়হীকে ছেড়ে আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। যদ্দিন ও বেঁচে আছে চুমৌনা করতে পারব না। চুমৌনাকী বাত সোচনা ভি নায় সাকেগী (সাঙার কথা ভাবতেও পারব না)।'

দ্রুত কথা বলতে বলতে ধানোয়ার আর আওরতটা নিজেদের অজান্তে পা চালিয়ে দিয়েছিল। বুড়ী চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ লাখপতিয়া, এত্তে জোর হাঁটছিস কেন? আমার গায়ে কি জওয়ান বয়েসের তাকত আছে? আমি কি তোদের সাথ দৌড়ে পারি? ধীরেসে চল্—'

ধানোয়াররা হাঁটার গতি কমিয়ে দেয়। মেয়েমানুষটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'লাখপতিয়া কৌন? তুমনি?'

মেয়েমানুষটা ঘাড় কাত করে বলে, 'হাঁ।'

'বহোত বঢ়িয়া নাম।' ধানোয়ার বেশ তারিফের গলায় বলে।

মেয়েমানুষটা জানায়, এটা তার বাপের দেওয়া নাম। তারপর মজা করে হাসে। বলে, 'পেটে দানা নেই, তবু আমি লাখপতিয়া! এক লাখ দশগো রুপাইয়া কভী নহীঁ দেখ। তভ্ভি (তবুও) হামনি লাখপতিয়া!'

ধানোয়ারও হাসতে থাকে।

লাখপতিয়া এবার বলে, 'আমাদের কথা তো সবই জেনে নিলে। লেকেন তুমনিকো বাত কুছ নহীঁ শুনা—'

'হামনিকো কা বাত। দুনিয়ায় হামনি বিলকুল একেলা—' নিজের আত্মীয় খবর বলে যায় ধানোয়ার।

পাকা সড়কটা বরাবর সোজা ছুটতে ছুটতে একটা বাঁক ঘুরে কোণাকুণি পুব-দক্ষিণে চলে গেছে। ওটা অগ্নিকোণ।

বাঁক পেরুতে পেরুতে শীতের বেলা জুড়িয়ে আসতে থাকে। সুরয পছিমা আকাশের ঢালের দিকে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রঙ বাসি হলদির মতো। উল্টোপাল্টা বাতাসে আরো হিম মিশে যাচ্ছে। অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে মাঠের ওপর নেমেছে সে জায়গাটা ঝাপসা ; ওখানে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে বুড়ী বলে, 'বহোত জাড় (ঠাণ্ডা)। এ বহু, আমার গায়ে কিছু জড়িয়ে দে না—'

লাখপতিয়া তার ঝোলা খুলে একটা তালিমারা ময়লা ভারী কাঁথা বার করে সযত্নে বুড়ীর সারা শরীর ঢেকে দেয়। তারপর সবাই আবার হাঁটতে শুরু করে।

এখনও ধানক্ষেতের দেখা নেই। তবে পাক্কীর দু ধারে প্রচুর গাছপালা ঝোপঝাড় চোখে পড়ছে। এত সবুজ কতকাল দেখে নি ধানোয়ার। সে যেখান থেকে আসছে সেখানে এবার প্রচণ্ড খরায় ধান তো ফলেই নি, গাছ লতাপাতা আগাছা—সব জ্বলে 'কোশের'

পর 'কোশ' হলদে হয়ে গেছে। এখানে মাঠভরা সবুজ সতেজ ঘাসবন এবং গাছটাছের দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যায় ধানোয়ারের।

বুড়ী বলে ওঠে, 'আউর কেত্তে দূর ?'

লাখপতিয়া বলে, 'থোড়া।'

'ঝুট।'

'সাচ।'

'থোড়া থোড়া করে দশ রোজ হাঁটাচ্ছিস। আউর নহী সাকেগী। কোমরিয়ার হাড্ডি চুর চুর হয়ে গেল।' বুড়া প্রায় কাঁদতেই শুরু করে।

শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে একই সঙ্গে মায়া আর কষ্ট হতে থাকে লাখপতিয়ার। বলে, 'সচমুচ বলছি, অন্ধেরা নামবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব।' ধানোয়ারকে শুধোয়, 'কা, ঠিক বোলা ?'

ধানোয়ার এ অঞ্চলে বেশ কয়েক বার এসেছে। সে ঘাড় কাত করে বলে, 'হাঁ—'

লাখপতিয়া বুড়ীকে বলে, 'তোকে তুরন্ত হাঁটতে হবে না, আস্তে আস্তে চল্—' বলে শাশুড়ীর কোমর সাপটে ধরে তার শরীরের অনেকটা ভার নিজের ওপর নেয়। মা-পাখি যেভাবে বাচ্চাকে আগলে আগলে রাখে, সেইভাবেই বুড়ীকে নিয়ে এগিয়ে চলে সে।

সুরয আরো খানিকটা নেমে পছিমা আকাশের নিচের দিকে একটা বিরাট সোনার কটোরা হয়ে যায়। রোদ নিভু নিভু হয়ে আসতে থাকে। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে শীতের হাওয়া শনশন ছুটে যায়।

এক ফাঁকে ধানোয়ার আর লাখপতিয়া ধুসো পোকায়-কাটা কম্বল বার করে গায়ে জড়ায়। এই শেষ বেলাতেই টের পাওয়া যাচ্ছে, রাতে শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়বে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকায় ধানোয়ার। তক্ষুণি খুশিতে আর উত্তেজনায় তার চোখমুখ চকচকিয়ে ওঠে। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক পরদেশী শুগা (টিয়া পাখি) আকাশ পাড়ি দিয়ে দক্ষিণে চলেছে।

ধানোয়ার প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'হামনিলোগন আ গিয়া। ধানের ক্ষেতি আর বেশি দূরে নেই। হো রামজী, তেরে কিরপা—'

লাখপতিয়া আর তার সাস প্রবল আগ্রহে একই সঙ্গে শুধোয়, 'ক্যায়সে সমঝা?'

'ঐ দেখ—' আকাশের দিকে আঙুল বাড়ায় ধানোয়ার।

চোখ তুলে দুই আওরত সরু আর মোটা গলায় বলে, 'পরদেশী শুগা—'

মা-বাপ মরবার পর খাদ্যের খোঁজে এক নাছোড়বান্দা আবিষ্কারকের মতো অবিরাম ছুটে বেড়াচ্ছে ধানোয়ার। গাছপালা লতাপাতা ঝোপঝাড় মাটি পাখি পোকামাকড় ইত্যাদি সম্বন্ধে তার বিপুল জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা। মাটির রঙ দেখে দশ 'মিল' (মাইল) তফাত থেকে সে বলে দিতে পারে ওখানে কী ফলে আছে। সারিবদ্ধ পিঁপড়ের চলাচল দেখে টের পায় কোথায় রয়েছে বাগনরের (পাকা কাঁচকলা) বন বা মাটির তলায় মিঠা কোন কন্দ। পোকামাকড় মৌমাছিরা তাকে নানারকম ফলপাকড় বা শস্যের সন্ধান দেয়। চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে খাদ্য ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকায় নি ধানোয়ার, অন্য কিছু ভাবার সময় পায়নি। একেক সময় পাখি আর পতঙ্গের পেছন পেছন ছুটে সে ফলমূল কি ফসলের জায়গায় পৌঁছে গেছে।

ধানোয়ার বলে, 'ঐ শুগা চলেছে ধানের ক্ষেতির দিকে।'

'হাঁ?' লাখপতিয়া অবাক হয়ে বলে।

'হাঁ। কেত্তে শুগা দেখেছ?'

'বহোত।'

'এত্তে শুগা যখন চলেছে তখন মালুম হচ্ছে বহোত ধান ফলেছে ওখানে।'

বুড়ী আচমকা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'এবার সচমুচ তা হলে ভাত খেতে পাব?'

লাখপতিয়া বলে, 'জরুর।'

'বহোত ধান যখন হয়েছে তখন বহোত ভাত খেতে পাব—না ?'

'হাঁ-হাঁ—'

'তুরন্ত পা চালা—' বুড়ীর সারা শরীরে বিজলী চমকের মতো কিছু খেলে যায়। সে প্রায় দৌড়ুতেই শুরু করে।

বিড়বিড় করে আপন মনে ধানোয়ার বলে, 'হো রামজী, হো বিষুণজী, তেরে কিরপা।'

॥ তিন ॥

সন্ধের কিছু আগে সূরয যখন দিগন্তের তলায় আধাআধি ডুবে গেছে, চারদিক কুয়াশায় আরো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় একটা পুরুষ আর দুটো আওরত দাক্ষণে ধানের ক্ষেতগুলোতে পৌঁছে যায়।

সামনের দিকে এবং ডাইনে-বাঁয়ে—যেদিকে যত দূর তাকানো যাক, শুধু ধান আর ধান। পেছন দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে, কমসে কম এক 'মিল' তো হবেই পড়তি নীচু জমি। সেখানে ঝোপঝাড় এবং আগাছার জঙ্গল। তারপর একটা মস্ত বিল চোখে পড়ে। বিলের ওপারে দিগন্ত জুড়ে বনভূমি।

দিনের শেষ রোদ এসে পড়েছে ক্ষেতগুলোর ওপর। অঢেল সোনালী শস্যে গোটা চরাচর যেন ঝলমল করতে থাকে।

পড়তি জমির ঝোপঝাড় থেকে বুনো জুঁই আর আসান গাছের গন্ধ ভেসে আসছে। কিন্তু সে সব গন্ধ ছাপিয়ে নাকে আসছে পাকা ধানের প্রাণমাতানো সুগন্ধ।

কত কাল পর মাঠভরা এত ধান দেখল ধানোয়ার ! গেল বছর এই মরসুমে সে ছিল আরা জেলায়, তার আগের সাল ছাপরায়, তার আগের সাল পালামৌতে কিন্তু এত অজস্র ধান চোখে পড়ে নি। চার

পাশে কোটি কোটি সোনার দানা দেখতে দেখতে সেই আশাটা বুকের ভেতর আবার সতেজ হয়ে ওঠে। উত্তর থেকে চার দিন একটানা হেঁটে আসা ব্যর্থ হয় নি। জরুর পেট ভরে ভাত খেতে পাবে সে। হো রামজী, হো বিষ্ণুজী অব তেরে কিরপা!

এদিকে সেই বুড়ীটা উর্ধ্বশ্বাসে ঝড়ের বেগ ছুটে আসার কারণে হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই প্রবল উত্তেজনায় সরু গলায় সে চেঁচাতে থাকে, 'কেত্তে ধান, কেত্তে ধান! এ বহু, ভাত খায়েগী—গরম ভাত্তা। দেড় দো সাল তুই আমাকে ভাত খেতে দিস নি।'

লাখপতিয়া সাসকে ভরসা দেয়, 'খাবি খাবি, ধানের মুলুকে এসে গেছি, সাধ মিটিয়ে ভাত খাস। থোড়া সবুর কর।' বলে ধানোয়ারকে ডাকে, 'এ আদমী—'

ধানোয়ার মুখ ফেরায়, বলে, 'কা?'

'এবার তুমি কী করবে?'

তক্ষুণি উত্তর দেয় না ধানোয়ার। ঘাড় তুলে এধারে ওধারে তাকাতে থাকে। তার চোখে পড়ে, 'পাক্কী' থেকে ডাইনে এবং বাঁয়ে কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। ডান দিকে মেটে রাস্তাটা যেখানে একটা নহরের কাছে গিয়ে থেমেছে ঠিক তার কাছাকাছি অনেকগুলো সিমার আর কড়াইয়া গাছ গা-জড়াজড়ি করে রয়েছে। গাছগুলোর তলায় বিশ পঁচিশটা লোক।

ধানোয়ার বলে, 'এখন পেঁড়গুলোর তলায় গিয়ে তো বসি, জিরোই। উসকা বাদ সোচেগা কা করে—'

'হামনিলোগ তুমনিকো সাথ যায়েগী?'

'আও—'

পাকা সড়ক থেকে তিনজন কাঁচা রাস্তায় নামে।

সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় আসতেই ধানোয়ার দেখতে পায় সবই প্রায় চেনা মুখ। দুপুরবেলা পাক্কীর ধারের পীপর গাছগুলোর তলায় এদেরই দেখেছিল সে। সেই আধনাঙ্গা ভুখা

হাভাতের দল। তাদের মধ্যে আধবুড়ো লোকটাও রয়েছে; গলায় লিট্টির ডেলা আটকে গেলে সে পানি দিয়ে তাকে বাঁচিয়েছিল।

আধবুড়ো লোকটা ধানোয়ারদের দেখে বলে, 'আ গিয়া? আও আও—'

ঝোলা-টোলা নামিয়ে তার পাশে বসে পড়ে ধানোয়ার। লাখপতিয়া এবং তার শাশুড়িও কাছাকাছি বসে পড়েছে। বুড়ী হাঁ করে একটানা হাঁপিয়ে চলে। নির্জলা ফাঁকা হুঁকো টানার মতো তার গলার ভেতর থেকে শ্বাসটানা সাঁইসাঁই আওয়াজ বেরুতে থাকে। ধানের গন্ধে গন্ধে শেষ দিকটায় দৌড়ে আসার জন্য ক্লান্তিতে এবং কষ্টে তার বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

ধানোয়ার শুধোয়, 'তোমরা কখন এখানে পৌছলে?'

লোকটা আঙুল বাড়িয়ে পছিমা আকাশের একটা জায়গা দেখিয়ে বলে, 'সূরযদেও যখন ওখানে ছিল তখন এসেছি।'

ভাল করে সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় নানা বয়েসের বাকী লোকগুলোকে দেখতে দেখতে ধানোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তখন তো বহোত আদমী দেখেছিলাম—পঁচাশ যাটগো। বাকা সবাই গেল কোথায়?'

লোকটা জানায়, সবাই এক জায়গায় থাকলে হবে কী করে? যদি কিছু মেলে ভাগাভাগি নিয়ে রক্তারক্তি হয়ে যাবে। কাজেই তারা দু ভাগ হয়ে এক দল এখানে চলে এসেছে। আরেক দল গেছে পাক্কীর ওধারের ধানক্ষেতগুলোর দিকে।

একটু চুপ করে থেকে ধানোয়ার শুধোয়, 'কীরকম বুঝছ?'

সে কী জানতে চায়, লোকটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে। বলে, 'ধানটান মিলবে কিনা—এই তো?'

'হাঁ—' ধানোয়ার ঘাড় কাত করে।

লোকটা বলে, 'এই তো এলাম। এত্তে কষ্ট করে, দশ পন্দর রোজ হেঁটে যখন এসেছি, ভাত না খেয়ে লৌটব নাকি? কভী নায়—'

'কী করে ধান-উন মিলবে, কুছ সোচা ?'

'নায়। সোচনা পড়ে (ভাবতে হবে)। এখন কিছু করা যাবে না। ঐ দেখ—' বলে লোকটা সামনের ক্ষেতিগুলোর দিকে আঙুল বাড়ায়।

আগেই ধানোয়ারের চোখে পড়েছিল, বেশির ভাগ ক্ষেতিতেই ধানকাটা চলছে। প্রতিটি জমির গা ঘেঁষে গৈয়া কি ভৈসা গাড়ি কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আদিবাসী মুণ্ডা, ওঁরাও আর মুসহররা ধান কেটে কেটে এনে গাড়িগুলো বোঝাই করছে। সব ক্ষেত্রেই ঘিউ-মালাই খাওয়া বিরাট চেহারার পহেলবানেরা ঘোরাঘুরি করছে। তাদের হাতে লোহা বা পেতলের গুল বসানো লম্বা লম্বা বাঁশের লাঠি। প্রতিটি জমিরই চার কোণে উঁচু উঁচু খুঁটির মাথায় মাচা বানিয়ে রাতে ফসল পাহারা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। মাচাগুলোর মাথায় চাল আছে কিন্তু বেড়া নেই। চারপাশে ফাঁকা।

ধানোয়ার জানে ফসলের মরসুমে হর সাল জমি মালিকেরা আদিবাসী কিষাণ আর মুসহরদের কাজে লাগিয়ে দেয়। মাসখানেক বা মাস দেড়েকের ফুরনের কাজ। ধান উঠে গেলেই তাদের কাজ খতম।

জাতে গঞ্জু হলেও মুসহর বা আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে আগে দু-চার বছর চাষের সময় ফুরনের কাজ নিয়ে বড় বড় মালিকদের জমিতে লাঙল দিয়েছে, বীজ রুয়েছে, শীতে ফসল কেটে তাদের খলিহানে (যেখানে শস্য রাখা হয়) তুলে দিয়েছে ধানোয়ার। কিন্তু আজকাল পুরা রোজ কাজ করার তাকত নেই তার। চেয়েচিন্তে, ভিখ মেঙে বা অন্য দশ রকম ফিকির করে এই সময়টা সে কিছু ধান যোগাড় করে। কিন্তু দক্ষিণের এই ক্ষেতিগুলোতে যেভাবে পাহারা রাখা হয়েছে তাতে লুকিয়ে চুরিয়ে দু মুঠো ধান নিয়ে আসবে, তার ভরসা খুবই কম। মা[illegible]লে পহেলবানেরা নির্ঘাত লাঠির ঘায়ে মাথা ছেঁ[illegible]দবে।

আধবুড়ো লোকটা তার মতোই হয়ত ভাবছিল। ধানোয়ারের মনের কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে. 'ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ধান আনা যাবে না।'

'তব্ ?'

'ধানকাটানিদের কাজ যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে, কিছু করার নেই।'

'তুমি বলছ ধান কেটে নেবার পর ঝড়তি পড়তি যা পড়ে থাকবে তাই কুড়োতে হবে ?'

এ অঞ্চলে, এ অঞ্চলে কেন, গোটা বিহার জুড়ে ফসল উঠবার পর মাঠে যা পড়ে থাকে তা কুড়িয়ে নিলে জমি মালিকরা বা তাদের পাহারাদারেরা কিছু বলে না। আবহমান কাল এখানে এ এক চালু নিয়ম।

দু-এক সাল মাঠকুড়ানিদের সঙ্গে ভিড়ে ধানোয়ার মাটি থেকে ধানের দানা কুড়িয়েছে। খোসা ছাড়িয়ে যে চাল পাওয়া গেছে তাতে একটা করে মাস ভরপেট দু বেলা ভাত খেতে পেয়েছে। এবারও যদি ধান কুড়োতে হয় তার আপত্তি নেই। যদ্দিন না মাঠ থেকে ধান কেটে নেওয়া হচ্ছে সে অপেক্ষা করবে। মোট কথা, ভাত খেতে পেলেই হল। হো রামজী, হো বিষুণজী, কত কাল সে ভাত খায় নি।

আধবুড়ো লোকটা কী বলতে যাচ্ছিল, বলা হয় না। তার আগেই দেখা যায়, নিচের ধানক্ষেত থেকে তিন চারজন পহেলবান কাচ্চীতে উঠে সোজা ধানোয়ারদের কাছে এসে দাঁড়ায়। তাদের একজন— ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা, চুলে কদম ছাঁট, চাঁদির পেছন দিকে সরু টিকি, নাকের তলায় মোটা গোঁফ, এক কানে আওরতদের মতো পেতলের মাকড়ি, প্রকাণ্ড মাংসল মুখে ছোট ছোট হিংস্র চোখ, পায়ে কাঁচা চামড়ায় পাক্কা তিন সের ওজনের ঢাউস নাগরা, পরনে ধুতি এবং লাল জামার ওপর মোটা কম্বল—মাটিতে লাঠি ঠুকে বলে, 'কা রে ভূচ্চরের দল, আয়া কঁহাসে ?'

কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় চব্বিশ পঁচিশটা মানুষের

বুকে ভয়ে কাঁপুনি ধরে যায়। কে কোত্থেকে আসছে, জানিয়ে তারা ভীতু নিরীহ জানবরের মতো পহেলবানদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ধান পেকেছে; খবর পেয়েই গিদ্ধড়ের পাল দৌড়ে এসেছিস?'

কেউ উত্তর দেয় না।

অন্য একটা পহেলবান এবার ভারী গলায় গর্জে ওঠে, 'ধান্দাটা কী তোদের—এ হারামজাদকি ছৌয়া?'

ভিড়ের ভেতর থেকে কাঁপা গলায় কে বলে ওঠে, 'কোই বুরা ধান্দা নহী পহেলবানজী।'

'ধান চোরির মতলব নেই তো?'

ধানোয়ারের পাশ থেকে আধবুড়ো লোকটা বলে, 'রাম রাম। নহী পহেলবানজী, চুরানেকা কোই ধান্দা নহী।'

চার পহেলবান এক সঙ্গে সতেজ লাঠি ঠোকে, 'বহোত হোঁশিয়ার। ধানকাটাই খতম হবার আগে ক্ষেতিতে নামলে খুন করে মাটিতে লাশ পুঁতে ফেলব। সমঝা?'

এমন একটা কাণ্ড যে পহেলবানগুলোর পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না কারো। হাভাতের দল একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, 'সমঝ গিয়া—'

পহেলবানেরা যখন ক্ষেতির দিকে পা বাড়াতে যাবে, আধবুড়ো লোকটা হঠাৎ বলে, 'একগো বাত—'

একটা পহেলবান কর্কশ গলায় বলে, 'কা রে?'

'আপলোগনকা ক্ষেতিতে আর ধান কাটানি লাগবে?'

'ধান কাটতে পারিস?'

'জী।'

'মনে হচ্ছে, লাগবে না। মুসহর আর ওঁরাও মুণ্ডাদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তব্—'

'কা?'

এবার খানিকটা মহানুভবতাই যেন দেখায় পহেলবানটা। বলে,

'আউর দশগো রোজ আগে এলে ধান কাটাইয়ের কামটা হয়ত পেয়ে যেতিস। কাল সুবে মালিক বড়ে সরকার আয়েগা। তার সাথ বাতচিত করে দ্যাখ। বড়ে সরকারকা কিরপা হো যায় তো কাম মিলেগা—'

'হাঁ—' আধবুড়ো লোকটা মাথা নেড়ে বলে, 'রামজী কিষুণজী ভরোসা—'

পহেলবান তার সঙ্গে আরেকটু জুড়ে দিয়ে বলে, 'রামজী কিষুণজী আউর বড়ে সরকার ভরোসা—'

আধবুড়ো লোকটা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'হাঁ হাঁ জরুর।'

ধান চুরির ব্যাপারে আরো একবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে পহেল-বানেরা কাচ্চী থেকে আবার ধানক্ষেতে নেমে যায়।

এদিকে পহেলবানদের সঙ্গে আধবুড়ো লোকটার কথাবার্তা শুনে লাখপতিয়ার বুড়ী শাশুড়ির মনে কেমন একটা সংশয় দেখা দিয়েছে। আচমকা মড়াকান্না জুড়ে দেয় সে ; তার হাঁ-করা মুখের ভেতর থেকে বিলাপের মতো একটানা আওয়াজ বেরুতে থাকে।

সবাই চমকে ওঠে। লাখপতিয়া শাশুড়িকে শুধোয়, 'কা রে, হুয়া কা? রোভী (কাঁদছিস) কায়?'

কান্না থামে না বুড়ীর, বরং ক্রমশ আরো প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। লাখপতিয়া তার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে নরম গলায় বলে, 'চুপ হো যা। কী হয়েছে বলবি তো?'

কান্না-মেশানো জড়ানো গলায় বুড়ী এবার বলতে থাকে, 'পহেল-বানেরা হোঁশিয়ার করে দিল, ক্ষেতিতে নামলে খতম করে দেবে। ক্ষেতিতে না গেলে ধান ক্যায়সে মিলি! ধান না মিললে ভাত খাব কী করে? ভাতের ভরোসা বিলকুল চৌপট।' কান্নাটা আচমকা কয়েক পর্দা চড়িয়ে দেয় সে। 'হো ভগোয়ান, দেড় দো সাল আমি ভাত খাই নি।'

বুড়ীকে কাঁদতে দেখে আশেপাশের কয়েকটা বাচ্চাও কান্না জুড়ে

দেয়। বুড়ীর দেখাদেখি তাদেরও সন্দেহ হয়েছে—হয়ত ভাত খেতে পাবে না। অথচ মা-বাপের সঙ্গে কেউ সাত রোজ, কেউ দশ রোজ হেঁটে এত দূরে ছুটে এসেছে।

লাখপতিয়া বুড়ী সাসকে বোঝায়, যেভাবেই হোক তাকে ভাত খাওয়াবে, জরুর খাওয়াবে। বাচ্চাগুলাকেও তাদের মা-বাপেরা একই সুরে আশ্বাস দেয়। তবু কেউ থামে না। বাতাসে অনেকক্ষণ কান্নার পাঁচমিশালী শব্দ ভেসে বেড়ায়।

॥ চার ॥

একসময় পছিমা আকাশের তলায় সুরয ডুবে যায়। দ্রুত সন্ধ্যা নামতে থাকে।

সেই বিকেল থেকে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। প্রথমে ছিল পাতলা, মিহি—এখন ক্রমশ গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মিশছে অন্ধকার। কুয়াশায় আদিগন্ত ধানের ক্ষেত, দূরে দূরে ছোট ছোট দেহাত আর মাথার ওপর অফুরন্ত আকাশ—সব একাকার হয়ে যেতে থাকে।

এদিকে আজকের মতো ধানকাটা শেষ হয়েছে। ফসল বোঝাই করে একের পর এক গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি ক্ষেতি থেকে উঠে এসে কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর পাশ দিয়ে সার বেঁধে পাক্কীর দিকে হেলে দুলে এগিয়ে যায়। গাড়ির চাকা থেকে অনবরত ক্যাঁচ কোঁচ ধাতব আওয়াজ উঠতে থাকে।

এখন বোধহয় পূর্ণিমা। বোঝা যায়, অনেক উঁচুতে আকাশে চাঁদির থালার মতো গোলাকার পুণমের চাঁদ উঠেছে। তবে স্পষ্ট নয়। কুয়াশা এবং হিম দুইয়ে যে ঘোলাটে জ্যোৎস্না নেমে এসেছে তাতে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

ঝাপসা অন্ধকারে ধানের ক্ষেতে যতদূর চোখ যায় আগুনতি আলো। রাত্তিরে নজর রাখার জন্য উঁচু উঁচু খুঁটির মাথায় যে মাচাগুলো খাড়া হয়ে আছে সেখানে হ্যাজাক জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মাচায় রয়েছে দু'জন চারজন করে পাহারাদার। এক দানা ধানও যাতে খোয়া না যায় তার জন্য যাবতীয় পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছে জমি মালিকেরা।

কাছাকাছি ক্ষেতির আলো দেখে তবু হ্যাজাক বলে চেনা যায় কিন্তু দূরের গুলো অস্পষ্ট। ছোট ছোট আলোর বিন্দু দেখে মনে হয় গোটা চরাচর জুড়ে হাজার হাজার জুগনু স্থির হয়ে আছে।

দেখতে দেখতে এই সন্ধেবেলাতেই খোলা মাঠ জুড়ে নিশুতি নামতে থাকে যেন। কড়াইয়া গাছের ডালে মাঝে মাঝে রাতজাগা কামার পাখির কর্কশ চিৎকার ছাড়া মাইলের পর মাইল জুড়ে কোথাও থেকে শব্দ নেই। তবে মাঝে মাঝে মাটির তলায় কোন অদৃশ্য স্তর থেকে ঝিঁঝিদের বিলাপ উঠে আসছে। আর আলোর ছুঁচের মতো কুয়াশা এবং অন্ধকার ফুঁড়ে ফুঁড়ে হাজার হাজার জোনাকি উড়ছে চারদিকে। নির্জন স্তব্ধ এই প্রান্তরে বিশ পঁচিশটা ভুখা নাঙ্গা হাভাতে মানুষ আর ক'টা পাহারাদার ছাড়া মনুষ্যজাতির আর কোন প্রতিনিধি নেই।

বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তুরে হাওয়াটা আরো কনকনে হয়ে উঠেছিল। এখন মনে হচ্ছে বরফে সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠে আসছে। ঠাণ্ডায় হিমে পঁচিশটা মানুষের রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে যেন। মায়েরা তাদের বাচ্চাগুলোকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিজেদের শরীর থেকে একটু 'ওম' দিতে চেষ্টা করছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে এক আওরত বলে ওঠে, 'বহোত জাড়। 'আগে'র (আগুনে) বাওস্থা না হলে হামনিলোগন নহীঁ বঁচেগা। ছৌয়াগুলোও শেষ হয়ে যাবে।'

আরেকটা মেয়েমানুষ বলে, 'ঘুর' (আগুনের কুণ্ড। এখানে শীতের রাতে গরীব মানুষেরা হাত-পা সেঁকে) বানাও।'

এটা আগেই বানানো উচিত ছিল। আসলে পাঁচ সাত কি দশ বিশ রোজ ধরে ক্রমাগত হেঁটে আসার ক্লান্তিতে সবাই বেজায় হাঁপিয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া অঢেল ধান দেখে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে 'ঘুরে'র কথাটা মাথায় আসে নি। অথচ এই মারাত্মক শীতের রাতে বিহারের খোলা মাঠে থাকতে হলে 'ঘুর' ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না।

সেই আধবুড়ো লোকটা ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'জরুর বানাতে হবে।' সে অন্য পুরুষগুলোকে ডাকে, 'আও আও—'

পুরুষগুলো বলে, 'কঁহা ?'

'শুখা লকড়ির তালাশে। 'ঘুর' বানাতে লাগবে না ?'

কারো ওঠার বিশেষ গরজ দেখা যায় না। একজন বলে, 'এখানকার কিছুই আমরা জানি না। অন্ধেরাতে কোথায় লকড়ি পাব ? একটা রাত থোড়েসে কষ্টউষ্ট করে গুজরনে দো। কাল সুবে ব্যওস্থা করা যাবে।'

আধবুড়ো লোকটা ধমকে ওঠে, 'নিকম্মার দল। তুমনিলোগ না হয় রাতটা কাটিয়ে দেবে। লেকেন ছোট বাচ্চাগুলোর কী হবে ? ওঠ, উঠে পড়—'

সবার আগে ধানোয়ারই ওঠে। বলে, 'আর কেউ না যাক, আমি যাব। চল—'

যাদের সংসার বউ বা ছোয়া নেই তারা যাচ্ছে। অথচ আর সবাই হাঁটুতে থুতনি গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকবে, এটা খুবই খারাপ দেখায়। বহোত বুরা বাত। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরো কয়েকজন উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চল তবে—'

সিমার এবং কড়াইয়া গাছগুলোর পুব দিকে পাক্কী। পশ্চিমে খানিকটা গেলে যে নহরটা, তার ওপর দিয়ে নড়বড়ে বাঁশের পুল। পুল পেরিয়ে ওরা ওপারে চলে যায়। চাঁদের ঝাপসা আলোয় ডান দিকের পড়তি জমিতে ছোটখাটো একটা জঙ্গল চোখে পড়ে। সেখানে

থেকে আসান গাছের শুকনো ডালপালা ভেঙে ফিরে এসে আগুন জ্বালায় ধানোয়াররা।

একটু পর দেখা যায় 'ঘুরে'র চারপাশে গোল হয়ে বসে চব্বিশ পঁচিশটা মানুষ আগুন পোহাচ্ছে। তবু বিহারের এই দুর্ধর্ষ শীত যেন কাটতে চায় না। মনে হয় শরীরে রক্ত চলাচল থেমে থেমে যাচ্ছে।

এখন কত রাত কে জানে। তবে সবাই টের পায়, ভুখে পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। রাতের খাওয়া এখনই চুকিয়ে নেওয়া দরকার। গামছার খুঁট বা ঝুলি খুলে কেউ বাসি রোটি, লিট্টি, আধ-পোড়া মকাই বা চার পাঁচ রোজ আগের সেদ্ধ-করা ঘাটো বার করে। সেই সঙ্গে নিমক, শুকিয়ে দড়ি-পাকানো হরা মিরচি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরুষেরা ওধারের নহর থেকে খাওয়ার জন্য লোটা ভরে জল নিয়ে আসে।

ধানোয়ার লাখপতিয়াদের কাছে বসে ছিল। সে একটা আধপোড়া মকাইতে লবণ আর মরিচ ঘষে চিবোচ্ছে। তার এক পাশে রয়েছে সেই আধবুড়ো লোকটা। সেই খাচ্ছে বাজরার রুটি। দুপুরের মতো এবারও ছাতু গুলে নিয়েছে লাখপতিয়া। অবুঝ বুড়ী শাশুড়ি কিছুতেই খাবে না। দুপুরবেলার মতো বুঝিয়ে সুঝিয়ে খাওয়াতে থাকে সে।

খেতে খেতে সবার সঙ্গে ভাল করে জান-পয়চান হয় ধানোয়ারের। আধবুড়ো লোকটার নাম রামনৌসেরা—জাতে তাতমা। ওপাশের কালো লম্বা হাড্ডিসার চেহারার লোকটা হল সখিলাল। সে এসেছে তার বউ সাগিয়া এবং দুটো বাচ্চাকে নিয়ে। মুখে চেচকের (বসন্তের) কালো কালো দাগ যে লোকটার তার নাম ফিতুরাম। সেও বউ বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে এসেছে। যার মুখের অর্ধেকটা পুড়ে মাংস ঝামার মতো হয়ে আছে সে হল টহলরাম। তার সঙ্গে রয়েছে বুড়ী মা। এমনি রয়েছে সোমবারী, রাতুয়া, মুঙ্গেরিলাল, বিরিজ এবং আরো কয়েকজন।

খেতে খেতে এবং সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ দুর্বলা গলায় কান্না যেন কেঁদে ওঠে. 'বহোত ভুখ মাঈ—বহোত ভুখ! ভাত দে, রোটি দে। এ মাঈ—'

চমকে ধানোয়ার এবং অন্য সবাই বাঁ দিকে তাকায়। 'ঘুরে'র এক কোণে একটা মেয়েমানুষ দুটো বাচ্চাকে জড়িয়ে বসে আছে। সবাই কিছু না কিছু খাচ্ছে, কিন্তু ওদেরই খাবার মতো কিছু নেই।

মেয়েমানুষটার বয়েস বেশি না, বড় জোর বিশ বাইশ। পরনে ছেঁড়াখোঁড়া পিঁজে-যাওয়া বহুকালের পুরনো একটা কাপড়। তার ওপর ময়লা কাঁথা জড়িয়ে দিয়েছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, অনেক দিনের না-খাওয়া ভুখা চেহারা। চোখের কোলে কালি, চুলে কতকাল যে কাকাই পড়ে নি! রোগা সরু গাঁটপাকানো আঙুল। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

চাপা গলায় আওরতটা বাচ্চাদুটোকে বলছে, 'শো যা, শো যা। রাত কাটুক। সুবে তাদের গরমভাত্তা দেব।'

'ঝুট—'

'নায় নায়। কাল সুবে জরুর খেতে দেব।'

ছেলে দুটো বুঝ মানে না। খিদের কষ্টে সমানে কাঁদতে থাকে, 'কাল না, আজ। আভি—'

তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভোলাতে চেষ্টা করে মেয়েমানুষটা। বলে, 'কাঁদে না, কাঁদে না।'

কান্না থামে না: বরং আরো প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। আর মেয়েমানুষটা ধৈর্য হারিয়ে হঠাৎ ছেলেদুটোকে বেদম মারতে শুরু করে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আমাকে খা। খা লে হামনিকো—' তার চিৎকার এবং বাচ্চাদুটোর কান্নার শব্দ এই নিস্তব্ধ শীতের রাতে কনকনে উত্তুরে হাওয়া চিরে চিরে ফাঁকা মাঠের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

দেখতে দেখতে ধানোয়ারের গলায় মকাইয়ের দানা আটকে

আসে। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রামনৌসেরা ধমকে ওঠে, 'এ আওরত মারো মাৎ, মাৎ মারো—'

এবার বাকী সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে, 'মেরো না, মেরো না। মর যায়েগা—'

'মরুক মরুক। এ দোনো মরনেসে হামনি বঁচ যায়েগী—' বলতে বলতে কেঁদে ফেলে মেয়েমানুষটা। তারপর জড়ানো জড়ানো আধবোজা গলায় যা বলে তা মোটামুটি এইরকম। কী করবে সে? আজ দো রোজ কোন জায়গা থেকেই একদানা খাদ্য যোগাড় করতে পারে নি। ফলে তারা বিলকুল না খেয়ে আছে। খাওয়ার জন্য দিবারাত্রি অনবরত ঘ্যানঘ্যান করে চলেছে বাচ্চাদুটো। একে নিজের পেটে ভুখ, তার ওপর ছেলেদুটোর এই ঘ্যানঘ্যানানি—তোমরাই বল, কারো মাথার ঠিক থাকে?

ধানোয়ার শুনেই যাচ্ছিল। এবার ঝোলা খুলে দ্যাখে আরো গোটা তিনেক আধপোড়া মকাই রয়েছে। একটা মকাই আর সেদ্ধ করা খানিকটা মেটে আলু বার করে মেয়েমানুষটাকে দিতে দিতে বলে, 'খেয়ে নাও। ছোঁয়া দুটোকে খিলাও—'

ধানোয়ারের দেখাদেখি নিজের নিজের ঝোলা খুলে আরো অনেকেই তাদের ভাজা রামদানা, আধখানা লিট্টি কি দু-একটা শুখা চাপাটি মেয়েমানুষটাকে দেয়। সবটাই ওরা খেয়ে ফেলে না। খানিকটা পরের দিনের জন্য রেখে বাকীটা খেতে শুরু করে।

রামনৌসেরা শুধোয়, 'কঁহাসে আতী হ্যায়?'

মেয়েমানুষটা বলে, 'গাঁও মনচনিয়া—'

'কঁহা?'

মেযেমানুষটা খাড়া পুব দিক দেখিয়ে দেয়।

রামনৌসেরা আবার বলে, 'তুমনিকো সাথ মরদ নহীঁ। কা— তুমনি রাণ্ডী?'

মেয়েমানুষটা মাথা নাড়ে। মকাইয়ের শক্ত দানা চিবুতে চিবুতে বলে, 'নহীঁ—'

'তব্ ?'

মেয়েমানুষটা জানায়, তার সাদি টুটে গেছে। কাটান ছাড়ানের পর মরদ তাকে এবং বাচ্চাদুটোকে ফেলে ফের সাগাই করে যোগবাণী চলে গেছে। নিজের পেট তো আছেই, তার ওপর এই বাচ্চা দুটো। তিনটে পেটের দানা জোটাতে তার শরীরের হাড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। কথায় কথায় আরো জানা যায়, তার নাম পরসাদী। জাতে কোয়েরী।

রামনৌসেরা শুধোয়, 'কা, তুমনি একঘরিয়া ?'

পরসাদী বলে, 'নহীঁ, দোঘরিয়া।'

অর্থাৎ দুজন 'পুরুখে'র বা পুরুষের ঘর করেছে সে। পরসাদী জানায় পয়লা মরদ মরবার পর 'দো লম্বর' মরদ তার 'জীওনে' আসে। কিন্তু সে চুমৌনাও (সাঙা) টিকল না।

'ফির চুমৌনা করলে না কেন ?'

'কা করে ? ছৌয়াসুদ্ধু কোন মরদ সাগাই করতে চাইল না।'

কথাটা ঠিক। স্ত্রীর আগের পক্ষের বাচ্চাদের দায় কে আর নিতে চায় ? এমন দয়ালু মহানুভব আদমী কোয়েরীদের মধ্যে একটিও জন্মেছে কিনা কে জানে।

খুব মন দিয়ে ওদের কথা শুনে যাচ্ছিল ধানোয়ার। এই আওরতটার সঙ্গে লাখপতিয়ার অনেকটাই মিল। পরসাদী তার বাচ্চাদের জন্য চুমৌনা করতে পারে নি ; লাখপতিয়া পারে নি তার বুড়ী গিধের মতো শাশুড়িটার জন্য।

'ঘুরে'র আগুন ঝিমিয়ে এসেছিল। আধপোড়া মুখ যার সেই টহলরাম শুকনো লকড়ি-টকড়ি আর পাতা দিয়ে আগুনটা গনগনে করে তোলে। জ্বলন্ত আসান কাঠ থেকে মিঠে সুগন্ধ উঠতে থাকে।

এক সময় খাওয়া-দাওয়া চুকে যায়। সবাই নিজের নিজের

পোঁটলা-টোটলা খুলে ছেঁড়া চট, কাঁথাকানি বা পোকায়-কাটা পুরনো ধুসো কম্বল বার করে 'ঘুরে'র চারপাশে গোল করে বিছানা পাততে শুরু করে। বিহারের এই হিমবর্ষী শীতের রাতে আগুন ছাড়া এই হাভাতে ভুখা আধনাঙ্গা মানুষগুলোকে বাঁচাবার আর কেউ নেই।

বিছানা হয়ে গেলে এক মুহূর্তও কেউ আর বসে থাকে না। হাত-পা বুকের ভেতর ঢুকিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে।

কুয়াশা আরো গাঢ় হচ্ছে। চাঁদের আলো বা ধানক্ষেতের হ্যাজাক-গুলো দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাহারাদারদের ঘুমন্ত গলা ভেসে আসে, 'হোঁশিয়ার। কেউ ক্ষেতিতে নামলে জানে খতম হয়ে যাবি। হোঁশি-য়া-য়া-য়া-র—'

সিমার আর কড়াইয়া গাছের কোকরে রাতজাগা কামারপাখিরা থেকে থেকে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। বাদুড় ডানা ঝাপটায়। নিঝুম প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধানবন চিরে চিরে হাওয়া ছুটতে থাকে অবিরাম। মৃদু বাজনার মতো পাকা ধানের শব্দ ভেসে আসে। ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন।

ধানোয়ারের চোখ বুজে এসেছিল। হঠাৎ খুব কাছ থেকে কেউ যেন মিঠে গলায় গেয়ে ওঠে:

'কৌন রঙ্গে হীরোয়া, কৌন রঙ্গে মোতিয়া।
কৌন রঙ্গে মজে মেরে ভৈয়া॥
কালে রঙ্গে হীরোয়া, লাল রঙ্গে মোতিয়া
সাঁবরে রঙ্গে নন্দো তেরে ভৈয়া॥'

মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে ধানোয়ার এধারে ওধারে তাকায়। একটু পরেই বুঝতে পারে রামনৌসেরা গাইছে।

চারপাশে সবাই মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। এক এক করে কাঁথা-কম্বলের তলা থেকে তারা মুখ বার করে:

টহলরাম বলে, 'বঢ়িয়া গানা—'

মুঙ্গেরি বলে, 'মিঠি গলা, কোয়েল য্যায়সা—'

ধানোয়ার তাজ্জব বনে গিয়েছিল। ঐরকম একটা আধবুড়ো চেহারার লোক, পেটের দানার জন্য যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঊর্ধ্বশ্বাসে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সে যে এমন গাইতে পারে—শুনেও যেন বিশ্বাস হয় না। ধানোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'মালুম হচ্ছে, গাওয়ার আদত আছে—'

এত জনের তারিফ শুনতে শুনতে গান থেমে গিয়েছিল। রামনৌসেরা বলে, 'আদত থা। এখন আর নেই। ভাতের তালাশে ঘুরতে ঘুরতে সব বিলকুল চৌপট হয়ে গেছে। বহোত রোজ বাদ ইচ্ছা হল, গাইলাম—' একটু থেমে বলে, 'যখন জোয়ান ছিলাম—উমর ছিল বিশ তিশ—তখন নওটঙ্কীর দলে গাইতাম।'

ধানোয়ার বলে, 'এমন জাদুভরি গলা—নওটঙ্কী ছাড়লে কেন?'

'বুখারে পড়লাম যে। গলা দিয়ে খুন উঠল। এক মুলুক থেকে আরেক মুলুকে ঘুরে রাতভর গানা গাওয়ার তাকত রইল না। নওটঙ্কী ছেড়ে দিলাম।'

গান থেমে যাওয়ায় লাখপতিয়া বিরক্ত হয়েছিল। বলে. 'বকর বকর থামিয়ে চাচাকে গাইতে দাও না—'

সবাই একসঙ্গে সায় দেয়, 'হাঁ—হাঁ—'

রামনৌসেরা মাথার ওপর কম্বল টেনে দিয়ে আবার গাইতে শুরু করে :

'কঁহা রে শোভে হীরোয়া,
কঁহা রে শোভে মোতিয়া
কঁহা রে শোভে ভৌজি মেরে ভৈয়া.
গলে শোভে হীরোয়া,
গহরে শোভে মোতিয়া,
আঁচরা শোভে নন্দো তোরে ভৈয়া।
টুট যায়েগা হীরোয়া,
বিখর যায়েগা মোতিয়া…'

কিছুক্ষণের মধ্যে সুরটা ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে এক সময় থেমে যায়।

ধানক্ষেতের পাহারাদার আর মাথার ওপর গাছের ফোকরে ক'টা কামার পাখি ছাড়া চরাচরে এখন আর কেউ জেগে নেই। চারদিকের গাছপালা, ঝোপঝাড়, জন্তুজানোয়ার, কীটপতঙ্গ—সমস্ত কিছুর ওপর গাঢ় গভীর নিশুতি নেমে এসেছে।

শব্দ নেই কিন্তু গন্ধ আছে। জ্বলন্ত 'ঘুরে' পোড়া আসান কাঠের গন্ধ, পেছনের ঝোপঝাড়ে বুনো জুঁইয়ের গন্ধ, আর সব গন্ধ ছাপিয়ে রয়েছে হিমেভেজা দিগন্ত জোড়া পাকা ধানের অফুরন্ত সুঘ্রাণ।

ভুখা হাভাতে মানুষদের জীবনে একটা রাত এইভাবে কাটতে থাকে।

॥ পাঁচ ॥

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়ে যায়। রোদ উঠে গেছে ঠিকই, তবে তার তেজ বা জেল্লা কোনটাই ফোটে নি। কুয়াশা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। আদিগন্ত ধানের ক্ষেত, ওধারের পাক্কী, এধারের কাঁচা রাস্তা, নহরের ওপর বাঁশের সাঁকো, তারও পর বাঁ দিকে ছোট ছোট গাঁও, গাঁও পেরিয়ে অনেক দূরে জঙ্গল—সব কিছুকে কুয়াশা মুড়ে রেখেছে।

রাত্তিরে 'ঘুরে'র আগুন কখন নিভে গিয়েছিল কেউ টের পায় নি। এই সকালেও বাতাস এত কনকনে যে কাঁথা-কম্বলের ভেতর থেকে হাত-পা বার করতে ভরসা হয় না। অবশ্য কম্বল-টম্বলও হিমে জল হয়ে আছে।

রামনৌসেরা বলে, 'রওদ (রোদ) ভালো করে না চড়লে জাড় কাটবে না। 'ঘুরে'র আগ জ্বালিয়ে নাও—'

কাঠকুটো দিয়ে আবার আগুন জ্বালানো হয়। হাত-পা সেঁকতে

সেঁকতে ধানোয়ার এবং আরো কয়েকজন রামনৌসেরাকে শুধোয়, 'সুবা হো গিয়া, অব্ কা করে ?' সকাল তো হয়ে গেল, এখন তাদের করণীয় কী, সেটাই জানতে চাইছে।

আসলে রামনৌসেরার ওপর সবাই ভরসা করতে শুরু করেছে। দেখামাত্র টের পাওয়া যায় তার অভিজ্ঞতা বিপুল। লোকটার চলাফেরা, হাবভাব, কথা বলার ভঙ্গি--সবই এই ভরসার কারণ। হাভাতেদের ধারণা হয়েছে, এই আধবুড়ো আদমীটার কথা মতো চললে ধানটান মিলতে পারে।

রামনৌসেরা বলে, 'বেলা বাড়ুক। মালিকরা ক্ষেতিতে আসুক। ভগোয়ান কিষুণজী আউর রামচন্দজী কিরপা করলে কুছ না কুছ একটা ব্যাওস্থা জরুর হয়ে যাবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রামনৌসেরা কী ভেবে শুরু করে, 'এখানে কত রোজ পড়ে থাকতে হবে, কে জানে। অঘুন (অঘ্রাণ) মাহিনা চলছে; এর মধ্যেই কা জাড়! এর পর তো পুষ (পৌষ) আছে মাঘ আছে। পেড়ের তলায় খোলা মাঠে পড়ে থাকতে হলে জাড়ে মরে যেতে হবে।'

'তব্ কা করে ?'

'জঙ্গল থেকে লকড়িটকড়ি এনে ঝোপড়ি বানিয়ে নিতে হবে।'

'ঠিক বাত।' সবাই একসঙ্গে সায় দেয়।

কথায় কথায় বেলা চড়ে। কুয়াশা ফেঁড়ে ফেঁড়ে উজ্জ্বল সতেজ রোদে চারদিক ভরে যায়। বাতাস থেকে কনকনে হিমেল ভাবটা আস্তে আস্তে কাটতে থাকে।

এর মধ্যেই বাসিমুখে সবাই ঝোলাটোলা থেকে তিন চার রোজ আগের তৈরি শুখা চাপাটি, লিট্টি, বা চানাসেদ্ধ বার করে খেতে শুরু করে।

একসময়ে দেখা যায়, সার বেঁধে গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি আসছে। পাক্কীর দিক থেকে কাঁচা সড়কে নেমে এসে সেগুলো ধানক্ষেতে ঢুকে

যায়। গাড়িগুলোর পেছন পেছন কাতার দিয়ে নামে মুসহরের দল আর আদিবাসী ধানকাটনিরা।

কিছু পরে দেখা যায়, ধান জমি থেকে কালকের সেই পহেলবানরা এবং তাদের সঙ্গে আরো কিছু লোকজন কাচ্চীতে উঠে আসছে। সারা রাত মালিকের ধান পাহারা দিয়ে এখন তারা খুব সম্ভব ঘরে ফিরছে।

কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর কাছাকাছি এসে লোকগুলো একটু দাঁড়ায়। রাতজাগার ফলে তাদের চোখ 'নিদে' ঢুলে আসছে। সেই পহেলবানটা—যে কাল ধানকাটাইয়ের জন্য ক্ষতিমালিকদের ধরতে বলেছিল—ঘুমন্ত গলায় এখন বলে, 'কা রে, অভিতক জিন্দা আছিস?'

রামনৌসেরা বলে, 'হাঁ।'

পহেলবান বলে, 'ভেবেছিলাম জাড়ে খতম হয়ে গেছিস।'

রামনৌসেরা জানায়, জাড়ে বা ঠাণ্ডায় তাদের মৃত্যু নেই। মরলে পেটের ভুখে মরবে।

পহেলবান বলে, 'ভুখে মরিস তো মরবি; কোই পারোয়া নেই। মগর হোঁশিয়ার—কেউ ক্ষতিতে নামবি না।'

রামনৌসেরা ভীষণ ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, 'হাঁ-হাঁ, হামনিলোগন বহোত হোঁশিহার পহেলবানজী।' একটু থেমে শুধোয়, 'মালিকরা কখন আসবে?'

পহেলবান জানায়, মালিকরা কোনদিন 'সুবে'তেই চলে আসেন, কোনদিন দুফারে, কোনদিন আবার বিকেলও হয়ে যায়। আবার কোন কোনদিন আসেনও না। সরগনা (গণ্যমান্য) বড়ে আদমীদের মর্জি! যখন ইচ্ছা হবে, আসবেন। দুশ্চিন্তা তো নেই। পাইসা দিয়ে ডর্জন ডর্জন (ডজন ডজন) নৌকর রেখেছেন, তারাই ধান পাহারা দেয়, মুসহরদের কাজকর্ম তদারক করে। মালিকের জমি এবং স্বার্থ রক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব তাদের।

পহেলবানেরা আর দাঁড়ায় না; ঢুলতে ঢুলতে পাক্কীর দিকে চলে যায়।

মুখে যার অগুনতি চেচকের দাগ সেই ফিতুর্লাল এবার বলে, 'অব্ কা করে? মালিকদের জন্যে কতক্ষণ বসে থাকব?'

রামনৌসেরা বলে, 'দেখি ঢুকার পর্যন্ত।'

এই সময় লাখপতিয়ার শাশুড়ীটা তীক্ষ্ণ সরু গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কা রে বহু, আজও ভাত খেতে পাব না?'

বুড়ীকে ভরসা দিতে দিতে লাখপতিয়া বলে, 'পাবি পাবি। একটু সবুর কর না।'

বয়স হলেও বুড়ার জ্ঞান এখনও পুরো টনটনে; বিশেষ করে ভাতের ব্যাপারে। তার প্রায় সব ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হয়ে গেছে; অনুভূতি-গুলোও তেমন কাজ করে না। শরীর এবং মনের সব কিছুই অসাড় আর ভোঁতা। অনুভব করার সামান্য যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে সেখানে ভাত ছাড়া জগতের আর কিছুই ধরা পড়ে না। ভাতের জন্য তার শিরাস্নায়ু হাড় পাঁজরা সর্বক্ষণ অস্থির এবং উত্তেজিত হয়ে থাকে। বুড়া বলে, 'ক্ষেতিমালিকরা কখন আসবে ঠিক নেই। তারা ধান কাটাইয়ের কাজ দেবে কিনা, ভগোয়ান রামজা জানে। কাম না মিললে পহেলবানেরা ক্ষেতিতে নামতে দেবে না। তা হলে ধান ক্যায়সে মিলি? ধান নায় মিলল তো গরম ভাত্তা ক্যায়সে খাওগী?'

বুড়ী যা বলল তার মধ্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। মনে মনে খানিকটা দমে গেলেও লাখপতিয়া বলে, 'চিল্লাস না। ভাত যখন তোকে খাওয়াব বলেছি,—জরুর খাওয়াব। এখন চুপ করে থাক।'

চারপাশে আর সবাই—যেমন ফিতুর্লাল, টহলরাম, সখিলাল এবং তার জেনানা সাগিয়া, সোমবারী, রাতুয়া—ধান আর ভাত নিয়ে অনবরত কথা বলে যায়।

আর লাখপতিয়ার বুড়া সাসের পাশে বসে আদিগন্ত ধানের দিকে

তাকিয়ে থাকে ধানোয়ার। চারপাশের কোন কথাই সে যেন শুনতে পাচ্ছে না।

কাল বিকেলের মতো আজও শীতের নিরুত্তাপ রোদে লক্ষ কোটি সোনার দানা ঝিকমিক করতে থাকে। হঠাৎ ধানোয়ারের চোখে পড়ে হাজার হাজার পরদেশী শুগা (টিয়া) চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে ক্ষেতিতে নামছে। শীষ থেকে বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে তারা অবিরাম ধান খেয়ে যায়।

কিছুক্ষণ আগে যে মুসহর আর মরশুমী অদিবাসী কিষাণরা ক্ষেতে নেমেছিল তারা এখন ফসল কেটে কেটে আলের ধারে টাল দিয়ে রাখতে শুরু করেছে। পরদেশী শুগারা যে এত ধান খেয়ে যাচ্ছে সেদিকে কারো হুঁশ নেই। অথচ ধানোয়ারের মতো ভুখা মানুষরা একটা ধানের শীষে হাত দিক, অমনি কুপিয়ে কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে দেবে পহেলবানেরা কিংবা গুল-বসানো লাঠি দিয়ে মাথা দু ফাঁক করে ফেলবে। বিড়বিড় করে সে বলে, 'হো রামজী, হো বিষুণজী এত্তে ধান ফলেছে, হামনিলোগ কি একমুঠো ভাত খেতে পাব না!'

বেলা আরো চড়ে যায়। কাল রাতে গাছের মাথায় রাতজাগা যে কামার পাখিরা কর্কশ গলায় ডেকে যাচ্ছিল, এখন তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। দিনের আলো চোখে লাগলেই ওরা চুপ হয়ে যায়।

কামার পাখিরা নেই, তবে সবুজ রঙের বেলা বাড়ার পাখিরা কিন্তু মাথার ওপর কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর ডালে অবিরাম ডেকে যাচ্ছে। এগুলো গরম কালের পাখি—সেই চৈত বৈশাখ মাসেই এদের দেখা যায়। তাজ্জবকী বাত, এই অঘান মাহিনায় কেন যে তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা কাটাচ্ছে, কে জানে। ওধারে পাক্কীতে স্রোতের মতো বাস, সাইকেল রিকশা, লৌরি (লরী) ছুটে যাচ্ছে। আর যাচ্ছে অজস্র গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ি। তা ছাড়া মানুষজন তো আছেই।

সুরয যখন পুব আকাশের খাড়া গা বেয়ে বেয়ে প্রায় মাথার ওপরে উঠে এসেছে সেই সময় হঠাৎ সখিলালের জেনানা সাগিয়া চাপা উত্তেজিত গলায় বলে, 'হুই—দেখো দেখো—' পাকা সড়কের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় সে।

পুরনো আমলের বড় বড় চাকাওলা একটা মোটর পাক্কী থেকে নেমে এদিকেই আসছে। গাড়িটার মাথা খোলা। তাই দেখা যাচ্ছে ভেতরে ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা বিরাট চেহারার একজন বসে আছেন। গাড়িটার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে দশ-বারোটা লোক। তাদের মধ্যে সেই চেনা পহেলবানেরা রয়েছে।

সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলা থেকে ধানোয়াররা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারো চোখেই পাতা পড়ছে না; নিশ্বাসও বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে।

আধবুড়ো রামনৌসেরা ফিসফিস করে বলে, 'জরুর ক্ষেতিকা মালিক হোগা—'

সখিলাল শুধোয়, 'কী করে বুঝলে—মালিক?'

রামনৌসেরা বলে, 'মালিক না হলে এত্তে বড় মোটরিয়া চড়ে কে আসতে পারে?'

সখিলালের যেটুকু সংশয় ছিল, কেটে যায়। রামনৌসেরার সঙ্গে একমত হয়ে বলে, 'ঠিক বাত চাচা।'

অন্য সবাই সায় দিয়ে যা বলে তা এইরকম। লোকটি মালিক না হয়েই পারেন না। মালিকদের ঢংঢাং চালচলন.জামাকাপড়া, সব কিছু অন্যরকম।

রামনৌসেরা ঠিকই ধরেছে। লোকটি ক্ষেতির মালিকই। নাম ত্রিলোকী সিং—জাতে রাজপুত ক্ষত্রিয়।

গাড়িটা এক সময় তাদের কাছাকাছি এসে থেমে যায়। এরপর রাস্তার যা ভাঙাচোরা হাল তাতে অত বড় 'মোটরিয়া'র পক্ষে এগুনো অসম্ভব।

গাড়ি থেকে সেই প্রকাণ্ড লোকটি অর্থাৎ ত্রিলোকী সিং নেমে আসেন। এবার তাঁকে ভালো করে দেখতে পায় ধানোয়াররা। প্রকাণ্ড গোল মুখ তার, ছোট ছোট লালচে চোখ। গলা বলতে প্রায় কিছুই নেই। পাহাড়ের মতো বিশাল শরীরের ওপর মাথাটা বসানো। চুল এমনভাবে ছাঁটা যাতে মাথার চামড়া দেখা যায়, পেছনে সরু একটা টিকি, থুতনির তলায় গোটা তিনেক ভাঁজ।

ত্রিলোকী সিংয়ের পরনে ধবধবে সাদা চুস্ত আর কলিদার পাঞ্জাবি, তার ওপর দামী কাশ্মীরী শাল। পায়ে পেতলের ফুল বসানো শৌখিন নাগরা। কানে সোনার মাকড়ি আর মোটা মোটা খাটো আঙুলে কমসে কম আটটা আংটি। কোনটা হীরের, কোনটা মোতির, কোনটা চুনীর। ত্রিলোকী সিংয়ের সমস্ত চেহারা জুড়ে রয়েছে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা।

কাচ্চী থেকে ত্রিলোকী ধানক্ষেতে নামতে যাবেন, রামনৌসেরা দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। হাত এবং চোখের ইশারায় গাছতলার পুরুষ এবং আওরতদের তার সঙ্গে আসতে বলে।

সবাই প্রায় দৌড়ে ত্রিলোকী সিংয়ের কাছে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'নমস্তে বড়ে সরকার।'

ত্রিলোকীর গোলাকার মাংসল মুখে আর ছোট ছোট লালচে চোখে বিরক্তি ফুটে ওঠে। কপাল কুঁচকে যায়। মোটা কর্কশ গলায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কে তোরা ?' কথা বলতেই মুখটা ফাঁক হয় ; তার ফলে দেখা যায় ত্রিলোকী সিংয়ের বেশির ভাগ দাঁতই সোনা বাঁধানো।

সবার হয়ে রামনৌসেরা বলে, 'গরীব ভুখে আদমী হুজৌর।'

'কা মাঙতা ?'

পাকা সড়কে এবং কাচ্চীতে যারা ত্রিলোকী সিংয়ের মোটরের পেছন পেছন দৌড়চ্ছিল, এখন তারা খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের ভেতর থেকে সেই পহেলবানটা জানায়, রাম-নৌসেরারা ধানকাটাইয়ের কাজ চায়।

পহেলবানটার নাম গিরধর। ত্রিলোকী সিং তাকে বলেন, 'গিরধর ভূচ্চরগুলোকে বলে দে, কামটাম মিলবে না। ধানকাটানিদের আমরা অনেক আগেই নিয়ে নিয়েছি।' বলে পা বাড়িয়ে দেন। নতুন নাগরার আওয়াজ ওঠে মস মস।

রামনৌসেরা তবু আশা ছাড়ে না। বলে, 'হুজৌর—'

ত্রিলোকী সিং বলেন, 'আবার কী? যা বলার বলে তো দিলাম—'

দুর্জয় সাহসে রামনৌসেরা এবার বলে, 'দোগো বাত সরকার—'

'কা?'

রামনৌসেরা জানায় হুজৌর যদি কাজের ব্যওস্থা না করে দেন, তারা বিলকুল মরে যাবে। কত কাল তারা ভাতের মুখ দেখে নি। কেউ দশ রোজ, কেউ পন্দর রোজ, কেউ এক মাহিনা, কেও তারও বেশি। এখন সবই বড়ে সরকারের 'কিরপা'। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের মতো ভুখা আদমীরা বেঁচে যায়।

এত কথা শোনার ধৈর্য নেই ত্রিলোকী সিংয়ের। আধাআধি শুনবার আগেই উঁচু আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। রামনৌসেরা ক্ষেতিতে নেমে খানিকটা তফাত দিয়ে যেতে যেতে সমানে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে। বাকী সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা কাচ্চীতেই দাঁড়িয়ে আছে।

আচমকা চিৎকার করে ওঠেন ত্রিলোকী সিং, 'গিরধর, জানবরের ছৌয়াটাকে লাথ মেরে ভাগিয়ে দে তো—'

গিরধর কিছু বলার বা করার আগেই অন্য একটা পহেলবান রামনৌসেরার গলা টিপে ধরে খানিকটা দূরে ছুঁড়ে দেয়।

ত্রিলোকী সিং ফিরেও তাকান না। আলের ওপর নতুন নাগরার আওয়াজ তুলে সোজা ধানের অরণ্যে ডুবে যান। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা তাঁর পিছু পিছু দৌড়তে থাকে।

রামনৌসেরার খুব চোট লেগেছিল। ক্ষেতি থেকে উঠতে গিয়েও

সে উঠতে পারে না। কোমরের হাড্ডি চুরমার হয়ে গেল কিনা কে জানে।

কাঁচা সড়কে দাঁড়িয়ে সবাই ভয়ার্ত চোখে এদিকেই তাকিয়ে ছিল। পাছে মালিক এবং তার লোকজন গুস্‌সা হয় সেই ভয়ে কেউ নিচে নামছিল না। ধানোয়ার কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। রামনৌসেরার জন্য তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। সে তো শুধু নিজের জন্য ক্ষেতিমালিকের কাছে তদ্বির করতে যায় নি. তাদের জন্যই গিয়েছিল। কাজের কাজ কিছু তো হলই না, উল্টে মার খেতে হল।

ধানোয়ার ক্ষেতিতে নেমে রামনৌসেরাকে টেনে তুলে বসায়। গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিতে দিতে শুধোয়, 'খুব চোট লেগেছে ?'

'হাঁ—' কোমরটা দেখিয়ে রামনৌসেরা বলে, 'এখানটায় ছাখ। মালুম হোতা হাড্ডি তোড় গিয়া।' যন্ত্রণায় তার মুখ কুঁকড়ে যেতে থাকে।

'জল দেব ?'

'দেও—'

হাড় সত্যিই ভাঙে নি। খানিকক্ষণ ডলবার পর যন্ত্রণা খানিকটা কমে রামনৌসেরার। ধানোয়ারের কাঁধে ভর দিয়ে সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ফিরে আসে সে। চাপা গলায় বলে, 'চুহাকা ছৌয়া—জানবর।'

গালাগাল ছুটো কাদের উদ্দেশে, সেটা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না।

খানিকটা সময় কাটে। সূরয পচিমা আকাশের দিকে হেলতে শুরু করে।

ক্ষেতিমালিকের কাছে দরবার করে কোন সুরাহা না হওয়াতে সবাই মুষড়ে পড়েছিল। ধানকাটাইয়ের কাজটা পেলেও ভাতের আশা ছিল। এখন সেই ভরসাটুকুও চৌপট। কবে তারা ফাঁকা মাঠ থেকে শস্যের কণা খুঁটে খুঁটে তুলতে পারবে তার কি কিছু ঠিকঠিকানা আছে। এত সব কাণ্ডের পরে তো ভাত।

এই বিপুল বিশাল আদিগন্ত ধানক্ষেতের ফসল উঠতে দশ দিন লাগতে পারে, বিশ দিন লাগতে পারে, হয়ত পুরো মাসই কেটে যাবে। এত দিন, এত দীর্ঘ সময় তারা খাবে কী? যে যেটুকু খাদ্য ঝুলিতে বেঁধে নিয়ে এসেছে তাতে বড় জোর আর দু-তিন রোজ চলতে পারে। কারো পুঁজি তার চাইতেও কম। কিছু একটা ব্যবস্থা না হলে এই কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় তাদের না খেয়ে মরে শুকিয়ে পড়ে থাকতে হবে। কে যেন ভীতু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'অব্ কা করে?'

রামনৌসেরা জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেখা যায় ডান পাশের ক্ষেতি থেকে একটা জোয়ান ধানকাটানি ফসল কাটা বন্ধ রেখে দৌড়তে দৌড়তে উঠে আসছে। ছোকরাটা আদিবাসী মুণ্ডা বা ওঁরাও না—মুসহর।

সবাই দু চোখে কৌতূহল এবং বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকায়।

মুসহরটা চনমন করে চারদিক দেখতে দেখতে কাছে এসে বলে, 'বড়ে সরকারের সাথ যখন বাতচিত করছিলে, আমি সব শুনেছি। এখানে তোমাদের নজদিগে যত ক্ষেতি দেখছ, সেখানে কোই ভরোসা নহীঁ। তুমনিলোগ এক কাম করো—'

সবার পক্ষ থেকে ধানোয়ার শুধোয়, 'কা?'

ধানকাটানি ছোকরা যা উত্তর দেয় তা এইরকম। চতুর্দিকে এই যে কোশের পর কোশ (ক্রোশের পর ক্রোশ) ধানজমি, এ সবের মালিক একা রাজপুত ত্রিলোকী সিং নয়। আরো তিনজন মালিক আছে। মৈথিলী বামহন ভানচন্দ ঝা, কায়াথ বজরঙ্গী সহায় আর ঝামরলাল গোয়ার। ঝামরলাল জাতে গোয়ালা, তবে নিজেকে বলে যদুবংশীছত্রি।

মুসহরটা বলে, 'এই তিনগো মালিককে গিয়ে ধর। ভগোয়ান কিরপা করলে একটা ব্যওস্থা হয়ে যাবে।'

মুখপোড়া টহলরাম শুধোয়, 'ঐ মালিকরা কোথায় থাকে ? কোন গাঁওমে ?'

মুসহরটা দ্রুত বলে যায়, 'পিপরিয়া গাঁয়ে থাকে ভানচন্দ ঝা, নওলপুরে থাকে বজরঙ্গী সহায় আউর ঝামরলাল গোয়ার থাকে গাঁও ছুধলিগঞ্জে।'

'বহোত দূর ?'

'নায়, নজদিগ।'

'কঁহা—থোড়েসে বাতাও না।'

'আর দাঁড়াতে পারব না। সড়ক দিয়ে কেত্তে আদমী চলেছে। তাদের পুছতাছ করো, গাঁওগুলো দেখিয়ে দেবে।' বলে ফের দৌড়ুতে দৌড়ুতে জমিতে গিয়ে নামে।

তার তাড়াহুড়োর কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মালিকের লোকেরা শুধু ধানই পাহারা দেয় না, গিধের মতো হাজার চোখ মেলে ধানকাটানিদের দিকেও নজর রাখে। তাদের আঁখে ধুলো ছিটিয়ে কাজে ঢিলে দেবার উপায় নেই।

সামান্য আশার রোশনি যখন দেখা গেছে, রামনৌসেরা আর সময় নষ্ট করতে চায় না। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে, 'তিনগো মালিকের কোঠিয়ায় এখনই যেতে হবে। লেকেন—'

ধানোয়ার ওধার থেকে শুধোয়, 'লেকেন কা ?'

রামনৌসেরা বলে, 'কোমরিয়ার চোট সারে নি। এখনও দুখাচ্ছে (ব্যথা হচ্ছে)। আমি যেতে পারব না।'

'হাঁ-হাঁ, তুমি থাকো।'

'বুড়হা-বুড়হী, বীমার আদমী আউর ছোটা ছোটা লড়কা-লড়কীরা থাক। আমি তাদের দেখে রাখব। বাকী সবাই যাও—'

ধানোয়ার উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চল, চল—' শক্তসমর্থ 'পুরুখ' এবং আওরতগুলোকে তাড়া লাগায় সে। খাদ্যের সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছে। আজকালের মধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে।

তাড়া খেয়ে মেয়ে এবং পুরুষগুলো উঠে দাঁড়ায়।

সবার সঙ্গে লাখপতিয়া আর সেই কোয়েরি আওরতটা অর্থাৎ পরসাদীও উঠে পড়েছিল। আচমকা তার বাচ্চা দুটো গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়। মাকে ছেড়ে তারা এই গাছতলায় থাকবে না। দু'জনে মাকে জড়িয়ে ঝুলতে থাকে। প্রথমে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে পরসাদী। বলে, 'তোরা রামনৌসেরা চাচার কাছে একটু থাক। আমরা যাব আর আসব।' ছেলে দুটো বুঝতে চায় না। তাদের চিৎকার ক্রমাগত চড়তেই থাকে। এবার পরসাদী ঝাড়া দিয়ে তাদের ছাড়াতে চেষ্টা করে, পারে না। ফলে ক্ষেপে গিয়ে চেঁচায়, 'মর মর ভূচ্চরেরা—'

রামনৌসেরা বলে, 'তোমার ছৌয়া দুটো বহোত বজ্জাত। বোঝালে বোঝে না। এক কাম কর ওদের সাথ তোমাকে যেতে হবে না।'

এদিকে লাখপতিয়াকে উঠতে দেখে তার বুড়ী সাস হাউমাউ করে মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছিল। জড়ানো দুর্বোধ্য গলায় সমানে পুতহুকে (ছেলের বউ) বলে যাচ্ছে, 'হামনিকো ছোড়কে মাত যা, মাত যা—'

লাখপতিয়া বলে, 'তোকে ছেড়ে কোথায় যাব? কাঁদিস না। তিনগো গাঁও ঘুরে আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি। ভাত খাবি তো?'

'খাব তো। দিচ্ছিস কই?'

'ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে না?' বলে যেই সে পা বাড়াতে যাবে, বুড়ীর চিল্লানি আরো কয়েক পর্দা চড়ে যায়। বিরক্ত গলায় সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'কা হুয়া?'

বুড়ী বলে, 'আমাকে ফেলে তুই ভেগে যাবি। তুই চলে গেলে জরুর হামনি মর যায়েগী।'

এই বিশাল পৃথিবীতে লাখপতিয়া ছাড়া বুড়ীর আর কেউ নেই। পুতহুই তার একমাত্র ভরসা, একমাত্র অবলম্বন। সে যদি কখনও

তাকে ফেলে চলে যায়, কে তাকে খাওয়াবে ? কে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে ?

বুড়ীর সর্বক্ষণ ভয় এই বুঝি তার যুবতী পুতহু পালিয়ে যায় ? এই বুঝি কেউ তাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে চুমৌনা করে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য জীর্ণ দেহের সবটুকু আকুলতা দিয়ে তাই সে লাখপতিয়াকে আঁকড়ে আছে।

লাখপতিয়া বলে, 'ভাগার হলে বহোত আগেই ভাগতে পারতাম। রামজী কসম, কিষুণজী কসম, বিষুণজী কসম—তোকে ফেলে হামনি নায় ভাগেগি, নায় ভাগেগি। তোকে ছেড়ে আমার মরারও যো নেই।'

এতগুলো সর্বশক্তিমান দেবতার নামে দিব্য কাটার ফল কতটা হয় বুড়ীকে দেখে ঠিক বোঝা যায় না। তবে তার কান্নার তোড় খানিকটা কমে আসে। সেই ফাঁকে ধানোয়ারদের সঙ্গে পাক্কীর দিকে চলে যায় লাখপতিয়া।

॥ ছয় ॥

পাক্কীতে এসে পথ চলতি লোকেদের জিজ্ঞেস করতেই তিনজন ক্ষেতমালিক আর তাদের তিনখানা গাঁওয়ের হদিস পাওয়া যায়। পিপরিয়া গাঁও এখান থেকে বেশ কাছেই ; পুব দিকে বড় জোর রশিভর হাঁটলেই পৌঁছুনো যাবে। নওলপুর অবশ্য খানিকটা দূরে। ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে পুব-উত্তরে কোণাকুণি কমসে কম আধা 'মিল' (মাইল) হাঁটতে হবে। তবে দুধলিগঞ্জ গাঁও বেশ দূরে। দো-তিন 'মিল' তফাতে—পুব-দক্ষিণ কোণে।

ধানোয়াররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করে, প্রথমে সব চাইতে কাছের গাঁ পিপরিয়ায় যাবে। ওখানে সুবিধা না হলে নওলপুর আর দুধলিগঞ্জে হানা দেবে।

পিপরিয়ায় এসে মৈথিলী বামহন ভানচন্দ্র ঝায়ের কোঠি খুঁজে বার করল ধানোয়াররা।

গোটা গাঁয়ের বেশির ভাগ বাড়িই টালি বা টিনের। খড়ের চালের মেটে বাড়িও দু-চারটে চোখে পড়ে। তবে ভানচন্দ ঝার কোঠিটা একেবারে আলাদা ধাঁচের।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে পুরনো আমলের দুর্গের মতো ভানচন্দের সুবিশাল তেতলা হাভেলি। পুরু দেওয়াল, মোটা মোটা থাম, লোহার পাত বসানো জানালা। বাড়িটা ঘিরে দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল; তার মাথায় ভাঙা ভাঙা কাচ সিমেন্টের ভেতর গেঁথে দেওয়া হয়েছে। চোর এবং ডাকুদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। তেতলার ছাদে 'রামসীতা' মন্দির। অনেক দূর থেকে মন্দিরের চোখা চূড়োটা দেখা যায়।

টানা পাঁচিলের এক জায়গায় প্রকাণ্ড ফটক। সেটার বিরাট বিরাট ভারী পাল্লায় পেতলের বড় বড় গুল বসানো রয়েছে। সেখানে ভোজপুরী দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে। লোকটা যেমন চওড়া তেমনি খাড়াই। কম করে সাড়ে চার হাত লম্বা তো হবেই। গায়ে প্রচুর লোম তার, মোটা ভুরু, বড় বড় গোল চোখ। নাকের তলায় ঝুপসি চৌগোঁফা গাল পর্যন্ত চলে গেছে।

পরনে খাকী উর্দি তার। কাঁধে দোনলা বন্দুক। বুকের ওপর দিয়ে টোটার মালা ঝুলছে।

ধানোয়াররা দূরে দাঁড়িয়ে ভানচন্দ ঝায়ের বড় কোঠিটা দেখল। এগুতে কিছুতেই ভরসা হচ্ছে না।

গালপোড়া টহলরাম বলে, 'দারবানটার কাঁধে কেত্তে বড়া বন্দুক। ওখানে গিয়ে কাজ নেই! চল ফিরে যাই।'

ধানোয়ার বলে, 'এত্তে দূর আয়া হ্যায় লৌটনেকে লিয়ে? কা রে?'

'তব্ কা করে?'

অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ চলে। তারপর, সবাই

ধানোয়ারের কথায় সায় দেয়। খুঁজে খুঁজে এত দূর আসা যখন হয়েছে তখন দেখাই যাক না। এমন কিছু কসুর তারা করেনি যাতে ভোজপুরী 'দারবান' বন্দুক হাঁকাবে।

দুরন্ত সাহসে ভর করে শেষ পর্যন্ত ভুখা আধানাঙ্গা মানুষের দল ভানচন্দের বাড়ির ফটকের সামনের এসে দাঁড়ায়।

দারোয়ানের চোখ কুঁচকে যায়। মোটা গলায় সে বলে, 'কা রে, কা মাঙতা ?'

হাতজোড় করে ধানোয়াররা জানায় তারা দর্শনমাঙোয়া; মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

হারামজাদার ছৌয়াগুলো বলে কী! শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না দারোয়ানের। পৃথিবীতে এর চাইতে বড় বেয়াদপির দৃষ্টান্ত আর কিছুই হতে পারে না। চৌগাঁফা ফুলিয়ে সে খেঁকিয়ে ওঠে, 'মালিকের সাথ দেখা করবে! বড়া ইজ্জৎদার আদমী আয়া! ভাগ চুহার পাল—'

তবু লোকগুলো নড়ে না। ধানোয়ার সবার প্রতিনিধি হিসেবে বলে, 'থোড়া কিরপা কীজিয়ে দারবানজী—'

হঠাৎ একটা ভারী গমগমে গলা ভেসে আসে, 'দারবান—'

'জী—' বলেই তটস্থ হয়ে ভেতর দিকে মুখ ঘোরায় দারোয়ান।

এবার ধানোয়াররা ফটকের মধ্য দিয়ে বাড়ির ভেতরকার খানিকটা অংশ দেখতে পায়। ফটকের দরজার পরেই অনেকটা ফাঁকা ঘাসের জমি। তারপর বাড়িটার একতলায় সাদা পাথর বসানো ঢালা বারান্দা। সেখানে গদি-মোড়া ইজিচেয়ারে একটা লোক কাত হয়ে পড়ে আছে। ঘিউ-শক্কর খাওয়া ভারী মাংসল চেহারা। গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা। বয়স ষাট-পঁয়ষাট। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দুধ-মাখখন খাওয়ার জন্য চামড়া থেকে এই বয়সেও জেল্লা ফুটে বেরুচ্ছে। পরনে ফিনফিনে কাপড় আর হলদে কুর্তা। কপালে এবং কানের লতিতে চন্দনের ছাপ। তাতে দেবনাগরীতে লেখা আছে, 'রামসীয়া' এবং

'রাধাকিষণ'। মাথার পেছন দিকে মোটা টিকিতে তিনটে মনরঙ্গোলি ফুলে বাঁধা রয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, ইনি ক্ষেতিমালিক ভানচন্দ ঝা না হয়ে যান না।

ভানচন্দও ধানোয়ারদের দেখতে পেয়েছিলেন। কপালে অনেক-গুলো ভাঁজ ফেলে বললেন, 'ঐ জানবরগুলো কারা? ভিখমাঙোয়া?'

দারোয়ান বলে, 'নায় সরকার। আপনার সাথ দেখা করতে চায়।'

বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ভানচন্দ ঝা। তারপর হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসতে বসতে বলেন, 'কী চাস তোরা?'

ভানচন্দ ঝা যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে ফটকটা বেশ দূরে। ধানোয়ারের ইচ্ছা, কাছাকাছি গিয়ে নিজেদের আর্জি জানায়। অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে সে বলে, 'হুজৌরকা হুকুম হো যায় তো হামনিলোগ অন্দর আয়েগা—'

লোকটার অসীম স্পর্ধায় মাথা গরম হয়ে ওঠে ভানচন্দের। দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'কী জাত তোদের?'

ধানোয়াররা জানায় তাদের কেউ দোসাদ, কেউ গঞ্জু, কেউ কোয়েরি, কেউ ধাঙড়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভানচন্দ শুধোন, 'অচ্ছুতিয়া!'

'হাঁ হুজৌর—' জল-অচল অস্পৃশ্য হবার গ্লানিতে ধানোয়াররা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর ভানচন্দ ঝা এবার বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েন, 'দারবান জানবরগুলোকে লাথ মেরে মেরে এখান থেকে ভাগাও। শুয়ারকা বচ্চে অচ্ছুতিয়ার পাল।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে শুরু করে ধানোয়ারেরা।

নওলপুরে গিয়েও কোনরকম সুরাহা হলো না। জাতপাতের ব্যাপারে কায়াথ বজরঙ্গী সহায়ের অত ছুয়াছুত নেই। দামী পাতলুন-

কামিজ পরা বজরঙ্গী পোশাকে এবং চলনে বলনে সাহেবী মেজাজের আদমী। ভানচন্দ ঝার মতো তিনি তাদের হাঁকিয়ে দিলেন না, বরং ভাল ব্যবহার করলেন। অসীম ধৈর্য নিয়ে তাদের আর্জি শুনলেন। তারপর মিঠা গলায় বললেন, নতুন ধানকাটানির দরকার নেই। মুসহর আর আদিবাসী মরসুমী কিষাণদের আগে থেকেই ঠিক করা আছে। হর সাল এই সময় এসে তারা ফসল কেটে 'খলিহানে' (যেখানে ফসল কেটে জমা করা হয়) তুলে দিয়ে যায়। পুরুষানুক্রমে এই নিয়মেই সব চলছে। কাজেই তাঁর পক্ষে ধানোয়ারদের জন্য কিছু করা সম্ভব না। বহোত দুখকী বাত।

বজরঙ্গী সহায়ের মিঠে কথায় কাজ না পাওয়ার ক্ষতিপূরণ কিছুই হয় না। তবে অত বড় একটা ক্ষেতিমালিকের ভাল ব্যবহারে ধানোয়াররা রীতিমত খুশীই হয়।

নওলপুর থেকে কোণাকুণি মাঠ ভেঙে এবার ওরা চলে আসে দুধলিগঞ্জে। কিন্তু যদুবংশী ঝামরলাল গোয়ারকে পাওয়া যায় না। চার রোজ আগে জরুরী কাজে তিনি পাটনা চলে গেছেন। ফিরতে ফিরতে অঘান মাস কাবার হয়ে যাবে।

ঝামরলালের খামার কাছেই। সেখানে গিয়ে তাঁর লোকজনের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, তাদের ধানকাটানি দরকার নেই। ফসলকাটার লোক আগে থেকেই তাদের ঠিক করা থাকে ; কী বছর এই সময়ে মরসুমী কিষাণরা এসে ধান তুলে দিয়ে যায়। অর্থাৎ বজরঙ্গী সহায়ের মতো ঝামরলাল গোয়ার এই ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। হয়ত রাজপুত ত্রিলোকী সিং আর মৈথিলী বামহন ভানচন্দ ঝার ক্ষেতিতেও এই প্রথাতেই ফসল কাটা চলে আসছে আবহমান কাল থেকে।

কাজেই এই অঞ্চলে এসে ধানোয়াররা যে 'গতরচূরণ' খাটুনি খেটে পেটের ভাত জোটাবে তার উপায় নেই।

তিন জায়গায় ব্যর্থ হয়ে সন্ধের খানিকটা আগে নির্ভূম হাভাতের দল কাঁচা সড়কের ধারে সেই সিমার এবং কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ফিরে আসে।

রামনৌসেরারা ধানোয়ারদের জন্য শিরদাঁড়া টান টান করে উদ্‌গ্রীব বসে ছিল। বেলা যত হেলে যাচ্ছিল, পাল্লা দিয়ে তাদের উদ্বেগও বাড়ছিল।

ওদের দেখে রামনৌসেরা শুধোয়, 'কা রে, কুছ হুয়া ?'

'সব বলছি। তার আগে পেটে কিছু ঢুকিয়ে নিই।' বলে ধানোয়ার তার পৌটলা খুলে তিন রোজ আগের তৈরী দুর্গন্ধওলা বাসি শুকনো লিট্টি বার করে। তার দেখাদেখি অন্য সকলেও।

সেই দুপুরে ত্রিলোকী সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তার পর না খেয়েই অন্য ক্ষেতিমালিকদের কাছে কাজের তালাশে বেরিয়ে পড়েছিল। কোন সকালে কী একটু খেয়েছিল তারা; তারপর থেকে এই সন্ধে পর্যন্ত এক বুঁদ পানিয়া পর্যন্ত খায় নি। ভুখে পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে যেন।

এদিকে লাখপাতিয়াকে দেখে মড়াকান্না জুড়ে দেয় তার শাশুড়ী। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুই ফিরে এসেছিস বহু, ফিরে এসেছিস!'

খেতে খেতে লাখপতিয়া বলে, 'এসেছি কিনা তুই বল।'

'হাঁ-হাঁ, ফিরেছিস। ও হামনিকো লছমী পুতহু, ও হামনিকো হীরোয়া মোতিয়া বহু—' মৃত ছেলের বউকে সমানে আদর করতে থাকে বুড়ী।

'রামজী কিষুণজীর নামে কসম খেয়ে বললাম, জরুর লোটেগী। তুই বিশোয়াসই করলি না তখন।'

'এখন বিশোয়াস করছি।'

'ঠিক আছে, এখন ছাড়। তোর সোহাগে আমার জান গেল।'

বুড়ী দু' হাতের বাঁধন আলগা করে দেয়।

এদিকে গোগ্রাসে খানিকক্ষণ লিট্টি চিবিয়ে ধানোয়ার রামনৌ-সেরাকে বলে, 'কাম নায় মিলি।' তারপর দূর দূর তিন গাঁয়ে তিন ক্ষেতিমালিকের বাড়িতে অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যায়।

জীবনে অনেক দেখেছে রামনৌসেরা; জগৎ এবং মানুষ সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। সব শুনে খুব একটা হতাশ হয় না সে। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলে, 'মুসিবতকা বাত। ধানকাটাইয়ের কাজটা পেলে ভাল হত।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই লাখপতিয়ার শাশুড়ী আবার কান্না জুড়ে দেয়, 'কা হোগা হামনিলোগকা? কাম না মিললে ভাত খাব কী করে?'

রামনৌসেরা বলে, 'চুপ হো যা লাখপতিয়াকে সাস, চুপ হো যা—'

আদিগন্ত ধানক্ষেতের ধারে কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় শীতের বিকেলে যে বিশ পঁচিশটা ভুখা আধনাঙ্গা মানুষ গা জড়াজড়ি করে বসে আছে, দু'দিন আগেও তারা কেউ কাউকে দেখেনি পর্যন্ত। বিহারের জেলায় জেলায় বহু দূরের সব গাঁয়ে তারা ঘুরে বেড়াত। পরস্পরের অচেনা এই সব লোকেরা ভাতের খোঁজে এখানে এসে একই পরিবারের মানুষ হয়ে গেছে; আর রামনৌসেরা যেন তাদের মুরুব্বি। সে জোর করে নিজের থেকে মুরুব্বি হয়ে বসেনি। জীবন সম্পর্কে তার জ্ঞান, বিপুল অভিজ্ঞতা, অসীম ধৈর্য এবং ঠাণ্ডা দিমাগ—সব মিলিয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই সে এদের অভিভাবক হয়ে উঠেছে। দু'দিন আগে যাদের এতটুকু 'জান-পয়চান' ছিল না তারাই এখন রামনৌসেরার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে।

ধানোয়ার শুধোয়, 'এখন আমরা কী করব, বল। আমার কাছে যা লিট্টি, রামদানা আছে তাতে দোগো রোজের বেশি চলবে না।'

গালপোড়া টহলরাম বলে, 'আমার আর এক রোজ চলবে।'

সোমবারী রাতুয়া মঙ্গেরি ফিতুলাল, এমনি সবাই জানায়, তাদের

কারো চার রোজের মতো খাদ্য রয়েছে, কারো তিন রোজের মতো, কারো বড় জোর দু বেলা চলতে পারে।

কোয়েরি আওরত পরসাদী করুণ মুখে বলে, 'হামনিকো কা হোগা? তোমরা সবাই কাল রাতে যা দিয়েছিলে তাতে আজকের রাতটাই শুধু চলবে। লেকেন কাল? কাল সুবেসে কা হোগা হামনিকো?'

রামনৌসেরা বোঝাতে থাকে, 'ঘাবড়াও মাত। জরুর কিছু একটা হয়ে যাবে।'

পরসাদী বলে, 'কুছ নায় হোগা। এবার ছৌয়া দুটোকে নিয়ে আমাকে ভুখা মরতে হবে।'

রামনৌসেরা আচমকা জিজ্ঞেস করে, 'তুহারকা উমর (বয়স) কেত্তে?'

থতমত খেয়ে যায় পরসাদী। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'হোগা বিশ তিশ—'

এবার ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একে একে সবার বয়স জেনে নেয় রামনৌসেরা। কারো বয়স ষাট, কারো পঁচাশ, কারো চল্লিশ, কারো সত্তর। তারপর আবার পরসাদীর দিকে ফিরে বলে, 'দ্যাখ এত্তে এত্তে সাল সবাই দুনিয়ায় টিকে আছে। তুইও বিশ তিশ সাল বেঁচে আছিস। এর পরও বেঁচে থাকবি। ডরাস না। নিজের ওপর ভরোসা রাখ আর আমাকে থোড়াবহোত সোচনে (ভাবতে) দে।'

ধানোয়ার বলে ওঠে, 'একগো বাত—'

রামনৌসেরা তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কা?'

'কাল 'ঘুর' জ্বালাবার লকড়ি আনতে নহরের ওপারে জঙ্গলে গিয়েছিলাম না—'

'হাঁ। তাতে কী হয়েছে?'

'আন্ধেরাতে নাকে একটা খুশবু এল।'

'কীসের খুশবু?'

'বাগনরের (পাকা কাঁচকলা)।'

টহলরাম ফিতুলালেরা বলল, 'আমরাও একসাথ গিয়েছিলাম। কই, খুশবু টুশবু তো পাইনি।'

কেমন করে ধানোয়ার বোঝাবে সেই কোন ছোটবেলা থেকে খাদ্যের খোঁজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে ; আর শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে এই উদ্দেশ্যে প্রখর আর সজাগ করে তুলেছে। খাদ্যের ব্যাপারে তার ঘ্রাণের শক্তি জন্তুর মতো, আর চোখে বাজপাখির নজর। অন্যেরা যে গন্ধ কখনও পায় না, সে একবার হাওয়ায় নাক ডুবিয়েই তা পেয়ে যায়। ধানোয়ার শুধু বলে, 'আমি পেয়েছি। ওখানে বাগনর না পেলে আমার মুখে তিন বার থুক দিও।'

রামনৌসেরা বলে, 'ঠিক হ্যায়। আজ তো 'সাম' হয়ে এল। কাল সুবেই জঙ্গলে গিয়ে দেখব। বাগনর বেশি পেলে দু-একটা রোজ চলে যাবে।'

কালকের মতো সন্ধ্যা নামতে শুরু করে। উত্তুরে হাওয়াটা সারা গায়ে বরফ মেখে সাঁই সাঁই ছুটতে থাকে। কুয়াশা আর হিমে চরাচর ঝাপসা হয়ে যায়। আর এই সময় ধানক্ষেত থেকে ফসল বোঝাই গৈয়া আর ভয়সা গাড়িগুলো কাঁচা সড়কে উঠে এসে ধানোয়ারদের সামনে দিয়ে পাক্কীর দিকে চলে যায়। সারাদিন ঘুমিয়ে থাকার পর কামার পাখিরা অন্ধেরা নামার সঙ্গে সঙ্গে আবার জেগে উঠেছে। কড়াইয়া এবং সিমার গাছের মাথায় কর্কশ গলায় তারা চেঁচাতে শুরু করে।

এই সময় চোখে পড়ে পাক্কী থেকে পঁচিশ তিরিশ জনের একটা দল কাঁচা সড়কে নেমে এদিকেই আসছে। দেখামাত্রই ধানোয়াররা টের পায় লোকগুলো তাদের মতোই হাভাতে।

কাছাকাছি এসে দলটা দাঁড়িয়ে যায়।

অন্ধেরা নামতেই 'ঘুরে'র আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে রামনৌসেরা দলটার উদ্দেশে বলে, 'কঁহাসে আতা হ্যায় তুমনিলোগ?'

একটা বুড়ো ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসে। মাথার চুল পুরো সফেদ। গায়ের কোঁচকানো চামড়া শীতে ফেটে ফেটে গেছে। কোমর থেকে একটা নোংরা চিটচিটে টেনা ঝুলছে। ওপর দিকে ছেঁড়া কাঁথা জড়ানো। একটা গামছা মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধা ; খুব সম্ভব অঘ্রান মাসের দুর্জয় শীত ঠেকাবার জন্য।

বুড়োটা জানায়, তারা এক জায়গা থেকে আসছে না। রামনৌ-সেরাদের মতোই কেউ আসছে উত্তর থেকে, কেউ দক্ষিণ থেকে, কেউ পশ্চিম থেকে। রাস্তায় আসতে আসতে তাদের জান-পয়চান হয়েছে।

রামনৌসেরা শুধোয়, 'জরুর ভাতের তালাশে এদিকে এসেছ ?'

বুড়োটা বলে, 'আমরা কেউ দশ বিশ রোজের ভেতর ভাতের 'মুহ্' দেখিনি।' তারপর বলে, 'ভেইয়া—'

'কা ?'

'তিন চার রোজ সমানে হাঁটছি। আউর চলনে নহীঁ সাকা। তোমাদের এখানে একটু বসব ?'

ওদের বসার কথায় খানোয়াররা কেউ খুশী হয় না। যদিও এখনও ভাতের ব্যবস্থা কিছু হয়ে ওঠে নি তবু নতুন ভাগীদারদের কে পছন্দ করে ? কিন্তু রামনৌসেরা আদমীটা একেবারে অন্য জাতের। সে তক্ষুণি বলে, 'হাঁ হাঁ, বোসো না।'

এক মুহূর্তও দেরি না করে ঝোলাঝুলি নামিয়ে দলটা 'ঘুরে'র আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ে। এই সময় দেখা যায় একটা জোয়ান ছোকরা পিঠ থেকে এক আওরতকে নামিয়ে পুঁটলি খুলে দ্রুত একটা ছেঁড়া চট বার করে পেতে ফেলে। আওরতটাকে খুব যত্ন করে চটের ওপর বসিয়ে নিজে তার পাশে বসে।

আওরতটার বয়স খুব বেশি না, বিশ কি পঁচিশ। শরীরের ওপর দিকটা তার ভালই, পুরোপুরি সুস্থ মানুষের মতো। কিন্তু নিচের অংশটা, বিশেষ করে হাঁটুর তলা থেকে পা দুটো শুকিয়ে গাছের মরা ডালের মতো ঝুলছে। দাঁড়াবার বা হাঁটবার শক্তি নেই তার। সেই

কারণে জোয়ান ছোকরাটার পিঠে চড়ে এসেছে। দেখে মনে হয় ওরা স্বামী-স্ত্রী।

ধানোয়ারেরা বিরক্ত অপ্রসন্ন মুখে নতুন দলটাকে দেখছিল। কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলছিল না। অবশ্য রামনৌসেরা বাদে।

নয়া আদমীগুলোর তরফ থেকে সেই সেই বুড়োটা এবার রামনৌসেরাকে শুধোয়, 'মালুম হচ্ছে তোমরাও ভাতের তালাশে এখানে এসেছ—'

'হাঁ—' রামনৌসেরা মাথা নাড়ে।

'কব ?'

'কাল আয়া।'

'কুছ ব্যওস্থা হুয়া ?'

'আভিতক নহী।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর রামনৌসেরা জমিমালিকদের কাছে তাদের ব্যর্থ অভিযানের কথা জানিয়ে বলে, 'এক গো বাত—'

বুড়োটা বলে, 'কা ?'

'আমরা বিশ-তিশ আদমী এখানে আগে থেকে বসে আছি। তোমরা বিশ তিশগো আদমী আজ এলে। এত্তে আদমী এক জায়গায় থেকে কোই ফায়দা নহী। এক কাম কর না—'

'কা ?'

পাকা সড়কের ওধারে আঙুল বাড়িয়ে দেয় রামনৌসেরা। বলে, 'ওখানে বহোত ক্ষেতি আছে। ধান ভি হুয়া বহোত। তোমরা ঐদিকে গিয়ে কোসিস কর।'

বুড়োটা বলে, 'ঠিক বাত। কাল সুবে হামনিলোগ চলা যায়েগা।'

এতক্ষণে ধানোয়ারদের বিরক্ত চোখমুখ সহজ স্বাভাবিক দেখায়।

কিন্তু আচমকা সেই জোয়ান ছোকরাটা যে মরা ডালের মতো শুকনো পা-ওলা আওরতটাকে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছিল—বলে, 'হামনি নায় যায়েগা। ইহাই রহ্ যায়গা।'

সবাই তার দিকে তাকায়। কেউ মুখ খোলার আগেই ছোকরা আওরতটাকে দেখিয়ে বলে, 'ওকে পিঠে চড়িয়ে মিলের পর মিল হেঁটে আসতে হামনিকো হাড্ডি বিলকুল 'চুরণ' হো গিয়া। আবার যদি ওকে কোথাও নিয়ে যেতে হয়—' একটু থেমে বলতে থাকে, 'হামনি জরুর মর যায়েগা, জরুর মর যায়েগা—'

রামনৌসেরা বলে, 'ঠিক হ্যায়। তুমনি দোনো ইহা রহ যাও।'

দু'জন বাড়তি মানুষ থাকলে অনিশ্চিত অন্নের ভাগ কতটা কমতে পারে, এ নিয়ে ধানোয়াররা কেউ আর মাথা ঘামায় না। বরং রুগ্ন পঙ্গু জেনানার জন্য ছোকরার ওপর তাদের খানিকটা সহানুভূতিই হয়।

রামনৌসেরাও হয়ত আর সবার মতো কিছু ভেবে থাকবে। সে ছোকরাকে শুধোয়, 'কা নাম তুমনিকো ?'

ছোকরা শুধু নামই না, তাদের জাতপাত এবং গাঁও আর জেলার খবরও দেয়। নাম তার লছমন, জাতে গঞ্জু, গাঁও ঝুমরণ, জেলা ছাপরা। ঝুমরণে সামান্য কিছু ক্ষেতি তার ছিল। ধান গেঁহু বা আখটাখ ফলিয়ে আর এটা সেটা করে কোনরকমে চালিয়ে নিত। সমসারও তার ছোট ছিল—সে আর তার মা। মোট দোগো পেট। সাত সাল আগে অজন্মার সময় ঝুমরণের সব চাইতে বড় ক্ষেতি-মালিকের কাছ থেকে অঙ্গুঠার (বুড়ো আঙুলের) টিপছাপ মেরে সে কিছু টাকা 'করজ' নেয়। সুদ-আসল মিলিয়ে ঋণটা ফুলেফেঁপে এমন মারাত্মক হয়ে ওঠে যাতে দো সাল আগে তার ক্ষেতিটা হাতছাড়া হয়ে যায়। বড় জমিমালিক সেটা পুরো হজম করে ফেলে। আর সেই বছরই সাত দিনের জ্বরে মা মরল। গেল বছর সেই বড় জমি-মালিকের ক্ষেতিতে পেটভাতায় লাঙল ঠেলেছে লছমন, নিজের খোয়ানো জমি থেকে ফসল কেটে মালিকের 'খলিহানে' তুলে দিয়ে এসেছে।

লেকেন এ সাল প্রচণ্ড খরায় ঝুমরণ এবং তার চারপাশের বিশ পঞ্চাশটা গাঁওয়ের তাবত মাঠঘাট জ্বলে গেছে। 'বারিষ' নেই তাই

চাষও বন্ধ। চাষ বন্ধ হলে কে আর তাকে কাজ দেবে! কিন্তু এসব কথা তো পেট মানে না। কাজেই কামাই এবং খাদ্যের খোঁজে সে ঝুমরণ গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর সাত রোজ হেঁটে সুদূর এই ধানের রাজ্যে চলে এসেছে।

লছমনের কথা শুনে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে রামনৌসেরা। বলে, 'বহোত দুখকী বাত। লেকেন—'

লছমন তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোয়, 'কা?'

'তুমি নিজের সব কথা বললে। লেকেন তোমার জেনানার কথা তো কিছু বললে না।' বলে চোখের কোণ দিয়ে পঙ্গু আওরতটাকে দেখিয়ে দেয় রামনৌসেরা।

লছমন প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। তার মুখেচোখে নিদারুণ অস্বস্তি ফুটে ওঠে। দ্রুত বলে ফেলে, 'নায় নায়, ছনেরি হামনিকো জেনানা নহীঁ। হামনি কুঁয়ার (অবিবাহিত) সাদি নহীঁ হুয়া—'

বোঝা যায় আওরতটার নাম ছনেরি। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। রামনৌসেরা বলে, 'তব কা?'

'ও আমার গাঁওয়ের লেড়কী।'

সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। গাঁও-এর লেড়কী কেন লছমনের পিঠে চড়ে এতদূরে এসেছে, ওরা তা জানতে চায়। অন্তত তাদের তাকানো দেখে তাই মনে হয়।

লছমন জানায়. ছনেরিরা জাতে ধোবি। ওর মা-বাপ নেই। এক ভাই ছিল; আড়কাঠিরা তাকে লোভ দেখিয়ে ফুসলে বেত-কাটাইয়ের কাজে আসামে পাঠিয়ে দিয়েছে। তিন সাল আগে সেই যে সে গেল আর ফিরে আসে নি। এই বিশাল দুনিয়ার কোথায় সে হারিয়ে গেছে. কেউ তার হদিস জানে না। বেঁচে আছে কিনা, তা-ই বা কে বলবে।

ভাই যদ্দিন ছিল, ছনেরির দুর্ভাবনা ছিল না। ক্ষেতমজুরের কাজ করে বোনকে খাওয়াতো। সে চলে যাবার পর কষ্টের শেষ নেই

ছনেরির। নিরুপায় হয়ে সে গিয়ে উঠেছিল এক দূর সম্পর্কের চাচেরা ভাইয়ের কাছে।

চাচেরা ভাইয়ের নিজেরই সংসার চলে না। তার ওপর বাড়তি দায় চাপতে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভাই আর ভাবী দিবারাত্রি তাকে গালাগাল দিত আর মৃত্যু-গমনা করত। কোনদিন খেতে দিত, কোনদিন দিত না। মুখ বুজে পড়ে থাকা ছাড়া পথ ছিল না ছনেরির। একে সে পঙ্গু, তা ছাড়া ছেলেবেলায় ভারী বুখারে ভুগে ভুগে গলায় স্থায়ী একটা দোষ হয়ে গেল। ভালো করে সে কথা বলতে পারে না। গলার ভেতর থেকে যে জড়ানো বিকৃত স্বর বেরোয় তার প্রায় সবটুকুই দুর্বোধ্য। তাকে এক রকম গুংগাই বলা যায়।

ঝুমরণ গাঁয়ের গঞ্জুটোলা আর ধোবিপাড়া পাশাপাশি। গঞ্জুটোলা থেকে বাইরের পাকীতে যেতে হলে ধোবিটোলার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যাতায়াতের পথে ছনেরিকে দেখে খুব মায়া হত লছমনের। আহা, বড় দুখী লেড়কী। কা তখলিফ মেয়েটার! দু-মুঠো খাদ্যের জন্য তার কী অপমান আর লাঞ্ছনা!

এবার খরায় যখন ঝুমরণ জ্বলে গেল ধোবিটোলা এবং গঞ্জুটোলার বাসিন্দারা প্রায় সবাই গাঁ ফাঁকা করে খাদ্যের খোঁজে নানা দিকে চলে গেছে। ছনেরির চাচেরা ভাই তার জেনানা এবং ছৌয়াদের নিয়ে ভিখমাঙনি হয়ে শহরের দিকে চলে গেল। কিন্তু ছনেরিকে সঙ্গে নেয় নি। নেবেই বা কী করে? সে যদি সুস্থ সবল মানুষ হত, ওদের সঙ্গে হেঁটে যেতে পারত। কিন্তু পরের সাহায্য ছাড়া যে দু হাত তফাতেও যেতে পারে না তাকে কে নিয়ে যাবে? তাকে নিতে হলে পিঠে চাপিয়ে নিতে হয়। চাচেরা ভাইদের কাছে অতখানি মহানুভবতা আশা করা অন্যায়।

ফাঁকা পরিত্যক্ত ঘরের দাওয়ায় বসে পেটের ভুখে এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় গোঙানির মতো শব্দ করে অবিরাম কাঁদত ছনেরি।

লছমন বলতে থাকে, 'গাঁও ছেড়ে একে একে সবাই চলে যাচ্ছে। কা করে, এই ছোকরিকে ফেলে আমি পালাতে পারলাম না। পিঠে চাপিয়ে পায়দল চলতে শুরু করলাম। চলতে চলতে পথে মানুষ-জনের কাছে খবর পেলাম, এদিকে ধান ফলেছে।

সবাই চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। শুনতে শুনতে তারা, বিশেষ করে ধানোয়ার লছমন সম্পর্কে এক ধরনের শ্রদ্ধাই বোধ করতে থাকে। যার সঙ্গে কোনরকম রিস্তাদারি নেই, এরকম একটা পঙ্গু আওরতকে সাত সাতটা দিন পিঠে চড়িয়ে ধানের দেশে যে নিয়ে আসে তার মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

রামনৌদেরা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, 'বহোত আচ্ছা কাম কিয়া। ভগোয়ান তুমনিকো ভালাই করেগা।'

লছমন উত্তর দেয় না; সামান্য হাসে।

এদিকে 'ঘুরে'র আগুন নিভে আসছিল। কাঠকুটো গুঁজে সেটাকে আবার গনগনে করে তোলে গালপোড়া টহলরাম।

কিছুক্ষণ পর দিগন্তের তলা থেকে পুনমের চাঁদ উঠে আসে। গাঢ় হিমের ভেতর দিয়ে চুইয়ে-আসা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় পূর্ব বিহারের এই প্রান্তর ক্রমশ অপার্থিব আর রহস্যময় হয়ে উঠতে থাকে। উত্তুরে বাতাস আজ কালকের চাইতে অনেক বেশি ঠাণ্ডা আর উল্টোপাল্টা।

মাথার ওপর কামার পাখিরা অনবরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে। 'ঘুরে'র আগুন দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে বাড়িয়া পোকা চারিদিক থেকে ছুটে এসেছে। মাঝে মাঝে রাতজাগা দু-একটা অচেনা পাখি হাওয়ায় ঢেউ তুলে ডেকে উঠছে। তাদের পরিষ্কার দেখা যায় না। শূন্যে অস্পষ্ট দাগ টেনে ধানক্ষেত দিয়ে তারা উড়ে চলেছে।

যথারীতি ধানক্ষেতের উঁচু মাচাগুলোতে হ্যাজাক জ্বলছে। আর থেকে থেকে পাহারাদারদের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। 'হোঁ-শি-য়া-র, কেউ ক্ষেতিতে নামবি না; জান চলে যাবে।'

রাত আরেকটু গাঢ় হলে নিজের নিজের পোঁটলা-পুঁটলি খুলে মকাই কি রামদানা, সেদ্ধ মেটে আলু বা চানার ছাতু বার করে, খেয়ে দেয়ে, মুড়ি দিয়ে 'ঘুরে'র আগুন ঘিরে গোল হয়ে শুয়ে পড়ে।

কালকের মতোই কম্বলের তলায় মুখ ঢুকিয়ে জাদুভরি মিঠে গলায় গুনগুনিয়ে নৌটঙ্কীর গান গাইতে শুরু করে রামনৌসেরা।

মোরি হাটিয়াসে নাথুনিয়া কুলেল করেলা
দেখিকে সবোকে মানোয়া ডোল ডোলেলা
মোরি হাটিয়াসে নাথুনিয়া···
নাথুনি পহান যব চলতি ডডরিয়া
দেখিকে লোকেয়া মারেলা নজরিয়া
হাঁসি হাঁসি ছৈলালোগ মেল তরেলা
মোরি হাটিয়াসে নাথুনিয়া···

গাইতে গাইতে একসময় গলা বুজে আসে রামনৌসেরার। কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় পঞ্চাশ ষাটটা হাভাতে নিরন্ন মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া সমস্ত চরাচর স্তব্ধ হয়ে যেতে থাকে।

অন্য সবার মতো ধানোয়ারও ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কাঁধের কাছে খোঁচা খেয়ে মাথার ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে ধড়মড় করে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, 'কৌন ?'

আর তখনই আওরতের চাপা গলা শোনা যায়, 'এ পুরুখ, এত্তে জোরে চিল্লিও না। আস্তে কথা বল।'

এবার চোখে পড়ে। মুখের ওপর থেকে ভারী কাঁথা সরিয়ে লাখপতিয়া তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কালকের মতোই সে তার শাশুড়ীকে নিয়ে ধানোয়ারের কাছাকাছি শুয়েছে।

ধানোয়ার অবাক হয়ে নীচু গলায় শুধোয়, 'কা হুয়া ? সে বুঝে উঠতে পারে না, এই মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে একঘরিয়া রাণ্ডী

আওরতটা তার কাছে কী চাইছে। খাদ্য ছাড়া আর কোন জৈবিক ব্যাপারেই সে এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত কোনরকম আকর্ষণ বোধ করে নি। তবু গোটা পৃথিবী যখন গাঢ় ঘুমে ডুবে আছে তখন এক শক্ত সমর্থ ডাঁটো চেহারার যুবতী আওরতের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে যায়।

লাখপতিয়া ফিসফিসিয়ে বলে, 'তুমি তখন বাগনরের কথা বলছিলে না?'

'হাঁ।'

'কাল সুবে আন্ধেরা থাকতে থাকতে, কেউ উঠবার আগেই তুমি আর আমি জঙ্গলে গিয়ে বাগনর নিয়ে আসব। এনে লুকিয়ে রাখব।'

'লেকেন—'

'লেকেন উকেন নহী। বুঝতে পারছ না, সবার সাথ গেলে ভাগে কম পড়ে যাবে।'

খাঁটি কথাই বলেছে লাখপতিয়া। আগে থেকে যতগুলো পারা যায় পাকা কলা এনে রাখতে পারলে পেটের ব্যাপারে কয়েক দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ধানোয়ার উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, 'ঠিক বাত। লেকেন—'

'ফির কা?' 'ঘুরে'র আগুনের আভায় দেখা যায় লাখপতিয়ার চোখ কুঁচকে গেছে।

ধানোয়ার জানায়, তার নিদটা বড়ই বেয়াড়া ; সহজে টুটতে চায় না। যদি আন্ধেরা থাকতে থাকতে না উঠতে পারে?

'বুরবাক নিকম্মা কঁহাকা—' চোখের কোণ দিয়ে ধারাল একটি নজর ধানোয়ারের বুকের ভেতর বেঁধাতে বেঁধাতে লাখপতিয়া বাতাসে গলার স্বরটা ভাসিয়ে দেয়, 'আমিই তোমার নিদ ছুটিয়ে দেব। লেকেন ধাক্কা দিলে শোর মচিয়ে আর কাউকে জাগিয়ে দিও না। তা হলেই সব চৌপট—'

'সমঝ গিয়া—'

'অব্‌শো যাও—' বলেই ধুসো ছেঁড়া কম্বলটা আবার মাথার ওপর টেনে দেয় লাখপতিয়া।

খানিকক্ষণ আওতরটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ঢাকতে শুরু করে ধানোয়ার।

ভুখা হাভাতে লোকগুলোর জীবনে আরো একটা দিন কেটে যায়।

পরের দিন লাখপতিয়ার ধাক্কা খেয়ে ধানোয়ার যখন উঠে বসে তখনও সকাল হয় নি। অন্ধকার এবং কুয়াশা চরাচরকে আচ্ছন্ন আর আড়ষ্ট করে রেখেছে।

হিমের পুরু স্তর ঠেলে আকাশের দিকে তাকালে বোঝা যায়, পুনমের চাঁদ এখনও দিগন্তের তলায় নেমে যায় নি। প্রথম রাতের তুলনায় শেষ রাতে জ্যোৎস্না আরো ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

ধানক্ষেতের হ্যাজাকগুলো এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। সমস্ত দিগন্ত জুড়ে জ্যোতিহীন নিস্তেজ চোখের মতো সেগুলো মিটমিট করে। পাহারাদারদেরও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত ভোরের এই আগে আগে তারাও ঘুমিয়ে পড়েছে।

লাখপতিয়া চাপা গলায় বলে, 'বহোত ভারী নিদ তুমনিকো, বহোত বুরা। বিশ বার ধাক্কা দিতে তবে নিদটা টুটল। আর শুয়ে থেকো না। সবার নিদ ভাঙবার আগেই আবার আমাদের এখানে ফিরে আসতে হবে।'

'হাঁ।'

'আমাদের এই কথাটা কেউ যেন জানতে না পারে।'

শীতার্ত রাতের শেষ প্রহরে অল্পচেনা এক যুবতী আওরতের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে লুকিয়ে লুকিয়ে খাদ্যের অভিযানে বেরিয়ে পড়ার মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা রয়েছে। পূর্ব বিহারের এই খোলা মাঠে অঘান মাসের দুরন্ত হিমেল হাওয়া যখন হাত-পা জমিয়ে দিচ্ছে, রক্ত-

স্রোতে বরফ ছোটাচ্ছে, সেই সময় অদ্ভুত এক উত্তাপ অনুভব করে ধানোয়ার। নীচু গলায় সে বলে, 'নায় নায়, কেউ জানতে পারবে না।' বলেই, ঝোলা খুলে ধারাল একটা দা বার করে উঠে দাঁড়ায়, 'চল—'

লাখপতিয়া উঠতে যাবে, সেই সময় রামনৌসেরার গলা শোনা যায়, 'এ ধানোয়ার, এ লাখপতিয়া—'

দু'জনে চমকে 'ঘুরে'র ডানদিকে ঘাড় ফেরায়। দেখে, কম্বল সরিয়ে মুখ বার করেছে রামনৌসেরা।

লাখপতিয়া বলে, 'চাচা তুমনি !'

'হাঁ—' আস্তে মাথা নাড়ে রামনৌসেরা। বলে, 'মাঝ রাত্তিরে তোমরা যা বলছিলে, সব শুনেছি। ইয়ে ঠিক নহী। বহোত বুরা (খারাপ) কাম।'

লাখপতিয়া বা ধানোয়ার কেউ উত্তর দেয় না। লজ্জায় এবং অস্বস্তিতে রামনৌসেরার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারে না। মুখ নীচু করে থাকে। চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ার মতো অবস্থা তাদের।

রামনৌসেরা বলতে থাকে, 'একসাথ হামনিলোগ ইধর (এখানে) আয়া। কিছু মেলে তো একসাথ ভাগ করে খাব। নায় মিলল তো নায় খায়েগা।' সে আরো যা বলে তা এইরকম। কাউকে না জানিয়ে এরকম চোরের মতো চুপকে চুপকে বাগনর আনতে যাওয়া বড় অন্যায়। বহোত শরমকী বাত।

লাখপতিয়া আর ধানোয়ার এবারও চুপ করে থাকে।

রামনৌসেরা বলে, 'অব্ শো যাও। সুবে হোক, রওদ উঠুক, তখন সবাই জঙ্গলে যাব।'

ধানোয়ার বা লাখপতিয়া এবারও কিছু বলে না। ভীষণ ব্যস্ত-ভাবে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

॥ সাত ॥

সকালে রোদ ওঠার পর নতুন হাতাতে যে দলটা এসেছিল, এক মুহূর্তও আর বসে না। কাল রামনৌসেরার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল সেই অনুযায়ী পাকা সড়কের ওধারের ধানক্ষেতগুলোতে চলে যায়। তবে ছনেরি আর লছমন এখানেই থাকে।

কালকের মতো আজও গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি, মরসুমী আদিবাসী কিষাণ, মুসহর আর পহেলবানদের এধারের ক্ষেতির দিকে আসতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দিগন্ত জোড়া ফসলের ক্ষেতে ধানকাটা শুরু হয়ে যাবে।

মুসহরদের দেখেই রাতের পাহারাদাররা ঢুলতে ঢুলতে ঘরে ফিরতে থাকে। তাদের আরক্ত চোখে তুনিয়ার সব ঘুম জমা হয়েছে। ঘরে গিয়েই তারা শুয়ে পড়বে।

পর পর দু'দিন দেখেই বোঝা গেছে, ক্ষেতিমালিকের পহেলবানদের একটা দল রাতে ফসল পাহারা দেয়। আরেকটা দল ধানকাটানিদের সঙ্গে সারা দিন জমিতে কাটিয়ে তাদের কাজের তদারকি করে।

রামনৌসেরা চড়তি সূরযের দিকে এক পলক তাকিয়ে সবাইকে তাড়া লাগায়, 'দের নায় করনা (দেরি করো না')। এবার জঙ্গলে যাওয়া দরকার। বুড়হা-বচ্চে, কমজোর আর বীমার আদমীরা ছাড়া সকলকে যেতে হবে।'

'হাঁ-হাঁ—' সবাই সায় দেয়।

'কতক্ষণ জঙ্গলে থাকতে হবে, ঠিক নেই। কিছু খেয়ে নাও।'

সবাই ঝোলাঝুলি ঝেড়ে মকাই-টকাই বার করে। পরসাদীর

পুঁটলিতে আর কিছুই নেই। ধানোয়াররা নিজেদের লিট্টি টিট্টি থেকে এক-আধ টুকরো ছিঁড়ে ওদের দেয়।

খেতে খেতে রামনৌসেরা বলে, জঙ্গলে যাওয়া হচ্ছে। বলা যায় না, সেখানে খতরনাক জানবর থাকতে পারে। কাজেই নিরস্ত্র ওখানে ঢোকা ঠিক না। দা বা টাঙ্গি না থাকলে কমসে কম একটা করে লাঠি হাতে থাকা চাই-ই।

খাওয়া-দাওয়ার পর শক্ত সমর্থ পুরুষ এবং মেয়েমানুষগুলো উঠে দাঁড়ায়। এমন কি পরসাদী আর রামনৌসেরা পর্যন্ত আজ চলেছে। তাদের সঙ্গে লছমনও যাচ্ছে।

কাল পরসাদী আর রামনৌসেরা ধানোয়ারদের সঙ্গে ক্ষেতি-মালিকদের বাড়ি যেতে পারে নি। রামনৌসেরা যেতে পারে নি কোমরের যন্ত্রণার জন্য। পরসাদীর ছৌয়া দুটো এমন কান্না জুড়েছিল যে কার সাধ্য তাদের রেখে যায়।

আজও ছৌয়া দুটো মাকে জঙ্গলে যেতে দেখে তুমুল চিল্লাতে শুরু করে। কিন্তু পরসাদী তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

টহলরাম রামনৌসেরাকে শুধোয়, 'চাচা তোমার না কোমরে চোট। তোমাকে জঙ্গলে যেতে হবে না।'

অন্য সবাই একই কথা বলে। কোমরে যন্ত্রণা নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া রামনৌসেরার পক্ষে ঠিক হবে না।

রামনৌসেরা বলে, 'কোমরিয়ার ব্যথা অনেক কমে গেছে। আমি যেতে পারব।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায় মেয়ে এবং পুরুষের দলটা ডান দিকের নহর পেরিয়ে কাচ্চী ধরে পশ্চিম দিকে বরাবর হাঁটতে থাকে। সবার হাতেই দা, টাঙ্গি বা ঐ জাতীয় কিছু।

আঁকাবাঁকা মেটে রাস্তার দু ধারেই ধানক্ষেত। তবে বাঁ ধারে, দূরে দূরে দু একটা হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাত চোখে পড়ছে। ডাইনে গাঁয়ের চিহ্নমাত্র নেই। বহু দূরে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। পরশু রাত্তিরে

ঘোলাটে চাঁদের আলোয় আন্দাজে আন্দাজে ওখান থেকে 'ঘুর' জ্বালাবার জন্য আসান আর সীসমের শুকনো ডাল এবং পাতা নিয়ে এসেছিল ধানোয়াররা।

আজ উত্তুরে হাওয়াটা অনেক বেশি জোরালো। ফলে ধানক্ষেত থেকে অনবরত শব্দ উঠতে থাকে—ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন। ধানের বাজনা শুনতে শুনতে ধানোয়াররা এগিয়ে যায়।

সেদিন রাত্তিরে কুয়াশা এবং অন্ধকারে পরিষ্কার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল জঙ্গলের সীমানা পর্যন্ত একটানা শুধুই ধানের ক্ষেত। কিন্তু খানিকটা যাবার পর ডান ধারে ফসলের জমি ফুরিয়ে যায়। শুরু হয় মাইলখানেক জুড়ে জলা জায়গা—অনেকটা বিলের মতো। তবে এই অঘান মাহিনায় বিলের বেশির ভাগটাই শুকিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। যেখানে যেখানে এখনও জল পুরোটা শুকোয় নি সে জায়গাগুলোতে চাপ চাপ কচুরিপানা। ডাঙা জায়গা-গুলোতে সর্বন ঘাস, দীর্ঘ বুনো ঘাস, নলখাগড়া—এমন নানা জাতের আগাছা এবং ঝোপঝাড়ে বোঝাই। তা ছাড়া সফেদিয়া, গোলগোলি এবং মনরঙ্গোলি ফুলে গোটা বিল ঝলমল করছে। আর আছে অনেকটা ডাঙা জায়গা জুড়ে কাশের বন। দু তিন মাস আগেও কাশের ফুলগুলো ছিল সজীব, সতেজ এবং দুধের মতো ধবধবে। অঘ্রাণের হিমে সেগুলো সজীবতা হারিয়ে কালচে এবং মলিন হয়ে উঠেছে।

বিলের জলে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়েছে শীতের জলচর পাখিরা। সিল্লী, কাঁক, লাল হাঁস আর মানিক পাখি। এত পাখি যে জল দেখা যায় না। কাঁক আর মানিক পাখির ডাকে স্তব্ধ বিল চকিত হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় একটা লোকও চোখে পড়ে নি। বিলের আধাআধি পেরুবার পর হঠাৎ দেখা যায়, এক বুড়ো ভৈসোয়ার (যে মোষ চরায়) মোষের পিঠে চড়ে উল্টো দিক থেকে আসছে। তার পেছন

পেছন আরো দশ বারোটা মোষ। ওরা আসছে বাঁ দিকের কোন একটা গাঁ থেকে।

বুড়ো ভৈসোয়ার—গায়ের চামড়া যার কুঁচকে গেছে, দু পাটিতে একটা দাঁতও নেই, গাল তোবড়ানো, ফাটা ফাটা হাত-পা, ছানিপড়া চোখ, কোমরে টেনা আর বুক-পিঠ কাঁথায় জড়ানো, মাথায় গামছা বাঁধা—ধানোয়ারদের কাছাকাছি এসে মোষটা থামিয়ে দেয়। ভুরুর ওপর হাত রেখে শুধোয়, 'মালুম হোতা নয়া আদমী। তোমাদের আগে এদিকে দেখি নি তো।'

রামনৌসেরা জানায়, তারা এ অঞ্চলে বিলকুল নতুনই।

ভৈসোয়ার বলে, 'তুমনিলোগনকা সাথ আওরতভি হ্যায়।'

'হাঁ।'

'ওদিকে যাচ্ছ কোথায় ?'

'জঙ্গলে।'

বুড়ো ভৈসোয়ার রীতিমত অবাকই হয়ে যায়। বলে, 'কায় ? জঙ্গলে যাচ্ছ কেন ?'

খাদ্যের খোঁজে যে যাচ্ছে সেটা আর বুড়োকে জানায় না রামনৌসেরা। বলে, 'থোড়া জরুরত হ্যায়।'

'বহোত হোঁশিয়ার রহনা জঙ্গলমে।'

'কায় ?'

'উধরি (ওখানে) খতরনাক জানবর হ্যায়।'

'কা জানবর ?'

'চিতিয়া আউর বরা (চিতা বাঘ এবং শুয়োর)।' বলে আর অপেক্ষা করে না বুড়ো ভৈসোয়ার। গোড়ালি দিয়ে মোষের পাঁজরায় একটা গুঁতো মেরে, আলটাকরায় জিভ ঠেকিয়ে টক্ টক্ আওয়াজ করতেই বিশাল জন্তুটা চলতে শুরু করে। ভৈসোয়ারকে থামতে দেখে পেছনের মোষগুলো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এবার তারাও হেলে দুলে চলতে থাকে।

রামনৌসেরারা আর দাঁড়ায় না। কাচ্চী ধরে সোজা এগিয়ে যায়। খানিকটা যাবার পর রাস্তাটা ডাইনে বেঁকে গেছে। বাঁকের মুখে আসতেই চোখে পড়ে, বুড়ো ভৈসোয়ার তার মোষগুলো নিয়ে বিলের ঘাসবনে নেমে পড়েছে।

সূরয যখন আরো অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে, আকাশে কোথাও এতটুকু কুয়াশা নেই, শীতের সোনালী রোদে সব ঝলমল করছে, সেই সময় দলটা জঙ্গলের কাছে পৌঁছে যায়।

বনভূমির সামনের দিকটা পাতলা। এখানে ওখানে সর্বন আর সাবুই ঘাস গজিয়ে আছে। ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা সাগুয়ান আর সিমার গাছ। তবে ট্যারাবাঁকা চেহারার অগুনতি সাসম এবং আসান চোখে পড়ছে। বেশির ভাগ সাসমই বুড়ো; সেগুলোর ডালপালা শুকিয়ে গেছে। এসব ছাড়া যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, মনরঙ্গোলি আর গোলগোলি ফুলের বাহার।

সবাইকে বার বার সতর্ক করে দিয়ে রামনৌসেরা প্রথমে জঙ্গলে ঢোকে; তার পাশাপাশি ধানোয়ার। বাকী দলটা আসে পেছন পেছন।

জঙ্গলের ভেতর রশিভর ঘোরাঘুরি করেও পাকা কলার সন্ধান যখন দেখা যায় না, রামনৌসেরা তখন বলে ওঠে, 'কঁহা তুমনিকো বাগনর—হো ধানবার?'

ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে শাণিত করে উত্তুরে হাওয়ায় গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিল ধানোয়ার। অন্যমনস্কর মতো সে বলে, 'হ্যায়-বহোতসে। আও হামনিকো সাথ।'

হাভাতের দলটা যেখানে এসে পড়েছে সেখান থেকে জঙ্গল ঘন হতে শুরু করেছে। শাল-সাগুয়ান ছাড়াও এখানে অর্জুন কেদ আর সিমার গাছের ছড়াছড়ি। সেগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে নানা ধরনের লতা। তবে বনজুঁইয়ের লতাই বেশি। সেগুলোর

গায়ে অগুনতি সাদা ফুল ফুটে আছে। বুনো জুঁইয়ের উগ্র গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। ধুঁধুর আর লাল টুকটুকে তেলাকুচ ঝুলছে পীপর গাছের ডালপালা থেকে। বনতুলসীর ঝাড় উদ্দাম হয়ে আছে চারদিকে।

জঙ্গল ঘন বলে তেমন রোদ ঢুকতে পারে নি। পাতার ফাঁক দিয়ে শীতের যে আলোটুকু এসে পড়েছে বনভূমিকে উত্তপ্ত করার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। এখানকার মাটি ভীষণ ঠাণ্ডা। রাতের পর রাত কুয়াশায় ভেজার ফলে নরম আর পিছল হয়ে আছে। শীতল মাটি থেকে এত বেলাতেও হিম উঠে আসছে। আর উড়ছে অজস্র বাড়িয়া পোকা। অদৃশ্য পতঙ্গরা চারদিক থেকে অনবরত অদ্ভুত শব্দ করে চলেছে—কিট কিট কিট।

ধানোয়ারের পিছু পিছু ঘন জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে আরো একবার চেঁচিয়ে ওঠে রামনৌসেরা, 'সব হোঁশিয়ার—'

খুব সম্ভব এই জঙ্গলে মানুষজন বিশেষ আসে না। নিঝুম বনভূমিতে মনুষ্যজাতির একটি দলকে এভাবে ঢুকতে দেখে মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে উড়ে চিৎকার করতে থাকে। কয়েকটা বাঁদর লাফালাফি করে এ-গাছ ও-গাছ হয়ে গভীর বনের দিকে চলে যায়। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সাপেদের বুক টানার শব্দ উঠে আসে।

টহলরাম আর ফিতুলাল একসঙ্গে বলে ওঠে, 'কা, আউর কেত্তে দূর ধানবার ভেইয়া?'

চোখের তারা স্থির হয়ে গেছে ধানোয়ারের। সবগুলো ইন্দ্রিয়কে নাকের মধ্যে জড়ো করে জোরে জোরে শ্বাস টেনে হাওয়ায় গন্ধ পাবার চেষ্টা করছিল সে। হঠাৎ ধানোয়ার চেঁচিয়ে ওঠে, 'মিলা গিয়া, মিলা গিয়া—' বলেই তীরের মতো সামনের দিকে ছুটে যায়।

খানিকটা দূরে অনেকগুলো কড়াইয়া গাছ গা-জড়াজড়ি করে দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোর পরেই বুনো কলার

ঝাড়। কমসে কম আধ 'রশি' জায়গা জুড়ে ঝাড়টা পাকা বাগনরে হলুদ হয়ে আছে।

ধানোয়ার এবার প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'হো রামজী, হো কিষুণজী, তেরে কিরপা—' সঙ্গে করে একটা ধারালো দা নিয়ে এসেছিল সে। উর্ধ্বশ্বাসে এবং প্রবল উত্তেজনায় দৌড়ে গিয়ে ঝাড়ের একেবারে প্রথমেই যে কলাগাছটা রয়েছে সেটার গায়ে কোপ বসিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে যায়। একটা বিরাট সাপ—কোথায় ছিল ভগোয়ান জানে, হয়ত কলাগাছটার গোড়ায় বা মাথায়—বিজরী চমকের মতো ল্যাজের ওপর ভর দিয়ে ধানোয়ারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে।

সাপটার গায়ে চাকা চাকা দাগ, ফণাটা প্রকাণ্ড। খাড়াইতে সাপটা ধানোয়ারের মাথা ছাপিয়ে আরো বিঘতখানেক উঁচু। চোখ দুটো লাল কাচের দানার মতো জ্বলছে। চেনা যায়, সাপটা গেহুমন। মারাত্মক বিষ তার।

এই শীতের ঋতুতে যখন পৃথিবীর যাবতীয় সাপ মাটির অতল স্তরে ঘুমোতে চলে গেছে তখন কী কারণে গেহুমনটা ওপরে থেকে গেছে, কে জানে।

ধানোয়ার আর সাপটার মাঝখানে স্রেফ চার-পাঁচ হাতের কারাক। কেউ এতটুকু নড়ছে না। স্থির পলকহীন চোখে তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। ধানোয়ার জানে সে একটু নড়লেই সাপটা ছোবল মারবে এবং তাতে অবধারিত মৃত্যু।

পেছন পেছন দৌড়ে আসতে আসতে বাকী সবাই ধানোয়ার এবং সাপটাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে গিয়েছিল। কে জানত, বাগনরের বন পাহারা দিচ্ছে এমন একটা ভয়াবহ বিষাক্ত সাপ। এই পৃথিবীতে তাদের মতো হাভাতেদের এত সহজে পেটের দানা জোটে না। দুনিয়ার সব খাদ্য কেউ না কেউ আগলে বসে থাকে। ওখানে পাকা ধানের ক্ষেত পাহারা দেয় পহেলবানেরা

আর বাগনরের ঝাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মারাত্মক গেহুমন সাপ।

ভয়ে আতঙ্কে রামনৌসেরাদের শ্বাস আটকে গেছে। কারো চোখে পাতা পর্যন্ত পড়ছে না। কেউ হাত-পা নাড়তে পর্যন্ত ভরসা পাচ্ছে না।

রামনৌসেরার ঠিক গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে লাখপতিয়া। ভয়ার্ত চাপা গলায় সে বলে, 'জহ্‌রিলা (বিষাক্ত) সাঁপ !'

রামনৌসেরার মাথা নড়ে না। হাওয়ার মতো ফিসফিসে গলায় বলে, 'হাঁ, গেহুমন।'

'আদমীটার কী হবে চাচা?' লাখপতিয়াকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন দেখায়।

রামনৌসেরা উত্তর দেয় না।

এদিকে সাপটার চোখের দিকে তাকিয়েই আছে ধানোয়ার। খাদ্যের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে কৈয়া, দাঁতাল, শুয়োর, চিতা বাঘ, বুনো মোষ—এমনি কত খতরনাক জানোয়ারের সামনেই না তাকে আজীবন পড়তে হয়েছে। জন্তুজানোয়ার, পাখি-পতঙ্গ, পোকামাকড়, সরীসৃপ—সমস্ত প্রাণিজগৎ সম্পর্কেই তার বিপুল অভিজ্ঞতা। সে জানে গেহুমনটার চোখ থেকে চোখ সরালেই নিশ্চিত মৃত্যু। পরস্পরকে জাদু করে একটি মানুষ আর এক ভয়াবহ সরীসৃপ সম্মোহিতের মতো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

রামনৌসেরার। যখন ভেবে উঠতে পারছে না কী ভাবে ধানোয়ারকে রক্ষা করবে ঠিক সেই সময় ছায়াচ্ছন্ন বনভূমিতে হঠাৎ বিজরী চমকে যায়। বিজরী না, ধানোয়ারের দায়ের ঝকঝকে ফলা ওটা। পরক্ষণেই দেখা যায়, সাপটার মাথা বিশ হাত দূরে উড়ে বেরিয়ে গেছে আর ধড়টা আলাদা হয়ে মাটিতে বার কয়েক দাপাদাপি করেই স্থির হয়ে যায়।

এইরকম একটা ভয়াবহ ঘটনার পরও ধানোয়ার একেবারেই

অবিচলিত। বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই তার। এক মুহূর্তও আর দাঁড়ায় না সে; খুবই নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সাপটার নিশ্চল মৃতদেহের পাশ দিয়ে কলাগাছের দিকে এগিয়ে যায়।

চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না রামনৌসেরাদের। ভয়ে উত্তেজনায় তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর তাদের বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস বেরিয়ে আসে। জোরে শ্বাস টেনে প্রায় একই সঙ্গে সবাই বলে ওঠে, 'হো ভাগোয়ান, তেরে কিরপা।'

কিন্তু এরকম ঘটনার পরও উত্তেজনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ভয়, উত্তেজনা বা আনন্দের অনুভূতি—সমস্ত কিছুই তাদের ক্ষণস্থায়ী। এই হাভাতেদের কাছে দুনিয়ার সব চাইতে বড় জিনিস হল পেটের ভুখ। খাদ্য ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে নষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত সময় তাদের নেই। একটু পরেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে বাগনরের ঝাড়-গুলোর ওপর দলটা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাগনরের কাঁদি কাঁধে ফেলে রামনৌসেরারা যখন কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় ফিরে এল, সুরয পছিমা আকাশের দিকে নামতে শুরু করেছে।

প্রচুর বাগনর পাওয়া গেছে। ভুখা আধনাঙ্গা মানুষগুলোর মুখে-চোখে একটা দিগ্বিজয়ের ভাব ফুটে ওঠে। যে অভিযানে তারা বেরিয়ে-ছিল সেটা পুরোপুরি সফল।

রামনৌসেরা কলাগুলো সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়। এক একজন যা পায় তাতে কম করে দিন দুয়েকের জন্য সবাই নিশ্চিন্ত। এই অকরুণ পৃথিবীতে পর পর দুটো দিন পেটের জন্য ভাবতে হবে না, এমন ঘটনা হাভাতেদের জীবনে কদাচিৎ ঘটে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাকা বাগনর দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নেয় রামনৌসেরারা। তারপর কেউ কেউ ঝুলি থেকে শুকনো তামাক

পাতা আর চুন বার করে হাতের চেটোতে ডলে ডলে খৈনি বানাতে থাকে। ভরপেট খাওয়ার তৃপ্তি তাদের চোখেমুখে।

ঠোঁটের ফাঁকে খৈনি গুঁজে মাঝে মাঝে থুতু ফেলতে ফেলতে রামনৌসেরারা ধানক্ষেতগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুসহর এবং আদিবাসী মরসুমী কিষাণেরা অবিরাম ফসল কেটে যাচ্ছে। কাল মাঠে যত ধান ছিল, আজ আর ততটা নেই। প্রতি দিনই ধানক্ষেত অনেকটা করে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

যত তাড়াতাড়ি ধান উঠে যায় ততই ভাল। তা না হলে রামনৌসেরারা মাঠে নামতে পারছে না।

খুব সম্ভব এই কথাটাই সবাই ভাবছিল। টহলরাম হঠাৎ ডাকে, 'এ চাচা—'

খয়েরি রঙের খানিকটা থুতু ফেলে রামনৌসেরা সাড়া দেয়, 'কায়?' মুখ অবশ্য ফেরায় না। ধানক্ষেতেই তার চোখ আটকে থাকে।

'পুরা ধান উঠতে কেতো রোজ লাগবে বলতে পার?'

'হোগা দশ পন্দর রোজ।'

'এত্তে?'

'কেত্তে ধান। দশ পন্দর রোজের আগে হয় কখনও।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় টহলরাম, 'ঠিক বাত—'

ওধার থেকে পরসাদী বলে ওঠে, 'লেকেন—'

মাঠের দিকে চোখ রেখেই রামনৌসেরা শুধোয়, 'লেকেন কা রে?'

'জঙ্গল থেকে যে বাগনর নিয়ে এসেছ তাতে দো রোজ চলে যাবে। উসকা বাদ কা হোগা?'

'হো যায়গা কুছ না কুছ। ঘাবড়াও মাত।'

রামনৌসেরা বড়ই আশাবাদী। কখনও কোন অবস্থাতেই হার মানতে বা ভেঙে পড়তে জানে না সে। অফুরন্ত আশাবাদ এতগুলো বছর তাকে এই পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রেখেছে। নিজের মধ্যেকার সেই

অদম্য উজ্জ্বল আশাকে রামনৌসেরা তার চারপাশের ভাঙাচোরা ভুখা ক্ষয়াটে মানুষগুলোর বুকে বীজের মতো বুনে দিতে চায়।

দেখতে দেখতে চোখের সামনে দিনটা ফুরিয়ে যায়। লক্ষ কোটি বছরের প্রাচীন আহ্নিক গতির নিয়মে সন্ধ্যা নামে। ফসল বোঝাই করে গৈয়া এবং ভৈসা গাড়িগুলো হেলেদুলে চলে যায়। ধানক্ষেতের উঁচু মাচায় মাচায় হ্যাজাক জ্বলে ওঠে। পাহারাদারদের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে, 'হৌ-শি-য়া র—'

অঘানের বাতাস কালকের চেয়েও আজ আরো শীতার্ত হয়ে উঠেছে। রাত ক্রমশ ঘন হতে থাকে। কুয়াশায় ধানক্ষেত, নহর, বাঁশের সাঁকো, দূরের বিল বা জঙ্গল—সব ঝাপসা হয়ে যায়।

সন্ধ্যে নামতে না নামতেই 'ঘুরে'র আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাত খানিকটা বাড়লে সবাই খেয়েদেয়ে আগুনের চারধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে।

অনেক রাতে চারদিক যখন নিশুতি, মাথার ওপর কামারপাখি আর ধানক্ষেতে পাহারাদাররা ছাড়া অন্য কেউ যখন জেগে নেই, সেই সময় কার ধাক্কা খেয়ে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় ধানোয়ারের। জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'কৌন রে, কৌন?'

কালকের মতো চাপা গলায় ওধার থেকে লাখপতিয়া বলে, 'চিল্লাও মাত—'

ঘুমটা ভাঙিয়ে দিতে ক্ষেপে গিয়েছিল ধানোয়ার। বিরক্ত গলায় সে বলে, 'কা, কা মাংতা?'

'কুছ নায়। একগো বাত থা—'

মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে ফিসফিসে গলায় কী এমন বলতে চায় লাখপতিয়া! খানিক ধানোয়ার শুধোয়, 'কা বাত? সারাদিনে বলতে পারো নি? কাঁচা নিদটা ভাঙিয়ে দিলে?'

লাখপতিয়া জানায়, দিনের বেলা সম্ভব হয়নি বলেই রাত্তিরে ঘুম ভাঙাতে হয়েছে। সে কথা সবার সামনে শোর মচিয়ে বলবার মতো নয়।

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে ধানোয়ার। বলে, 'তব ?'

গলার স্বরটা আরো কয়েক পর্দা নামিয়ে লাখপতিয়া বলে, 'রামনৌসেরা চাচা বলেছিল বাগনর সবাই সমান ভাগ করে নেবে। লেকেন চুপ্‌কে চুপ্‌কে আমি একটা কাজ করেছি।'

'কা ?'

'জঙ্গল থেকে যে বাগনর এনেছি, সব ওদের দেখাই নি। ক'টা আগেই পেটের কাপড়ার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম।'

হঠাৎ ধানোয়ারের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'হামান ভি। চার গো কেলা আমিও কাপড়ার ভেতর লুকিয়ে এনেছি।'

দেখা যাচ্ছে রামনৌসেরা প্রেরণা দেওয়া সত্ত্বেও ধানোয়ার আর লাখপতিয়া পুরোপুরি নিঃস্বার্থ এবং মহানুভব হয়ে উঠতে পারে নি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর লাখপতিয়া বলে, 'ক্ষেতির পুরা ধান উঠতে এখনও অনেক দেরি। আমাদের কয়েক রোজ এখানে থাকতে হবে।'

ধানোয়ার বলে, 'হাঁ।'

'যদ্দিন না ক্ষেতি থেকে ধান কুড়োতে পারছি তদ্দিন তো কুছ খেতে হবে।'

'হাঁ।'

'মনে হচ্ছে জঙ্গল থেকে সুথনি, কচুয়া, মাটিয়া আলু জুটিয়ে এনে পেট ভরাতে হবে।'

'হাঁ।'

'জঙ্গলে যা মিলবে সবাইকে তার অত ভাগ দিতে পারব না। দু'জনে লুকিয়ে কিছু রেখে দেব।'

এ বিষয়ে পুরোপুরি সায় আছে ধানোয়ারের। সে তৎক্ষণাৎ বলে, 'হাঁ—'

লাখপতিয়া কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, আচমকা তার বুড়ী সাসের

গলা শোনা যায়, 'কা রে বহু, ধানবারের সাথ কী অত ফুস ফুস করছিস ?'

চমকে ডাইনে তাকায় দু'জনে। লাখপতিয়ার গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে ছিল বুড়ীটা। কখন যে তার ঘুম ভেঙে গেছে আর কখন যে মুখের ওপর থেকে ধুসো কম্বল সরিয়ে কান খাড়া করে সে পুতহু আর আধচেনা ধানোয়ারের কথা শুনতে শুরু করেছে, কে জানে।

চোখের তারা স্থির করে একবার ধানোয়ার, আরেক বার পুতহুকে দেখতে থাকে বুড়ী আর ছুঁচের মতো সরু তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচায়, 'কী ধান্দা তোদের ?'

'কোই ধান্দা নহীঁ। এখন ঘুমো।'

'নায় নায়, তোরা জরুর আমাকে ফেলে ভাগবি।'

'আমাদের সব কথা তো শুনেছিস। ভাগবার কথা বলেছি ?'

'সব কথা শুনিনি।'

'যা শুনেছিস তাতে কী মনে হল ? ভাগব—কা রে বুড়হী ?'

বুড়ী উত্তর না দিয়ে শুধোয়, 'জোয়ানী আওরত হয়ে কেন তা হলে পুরুখটার সাথ মাঝ রাতে ফুস ফুস করছিস ? রামচন্দজীকা কহানী শোনাচ্ছিলি একজন আরেকজনকে ?' বলেই আচমকা হাউমাউ করে মড়াকান্না জুড়ে দেয় সে।

লাখপতিয়া এবং ধানোয়ার ভয়ানক চমকে ওঠে। লাখপতিয়া ব্যস্তভাবে বলে, 'রো মাত, রো মাত। সব কোইকা নিদ টুটেগা—'

বুড়ীর কান্না থামে না। অগত্যা তাকে নিজের কম্বলের তলায় ঢুকিয়ে বুকের ভেতর জড়িয়ে লাখপতিয়া গাঢ় গলায় সমানে বলতে থাকে, 'তোকে ফেলে আমি কি ভাগতে পারি। মন হলে কবে ভাগতে পারতাম। কাঁদে না, কাঁদে না—'

বুড়ী হেঁচাক তোলার মতো শব্দ করতে করতে বলে, 'তুই কোন পুরুখের সাথ কথা বললে আমার ডর লাগে। কী বলছিলি ধানবারকে ?'

'যা বলছিলাম তাতে তোর ডরাবার কিছু নেই। ঘুমো এখন, ঘুমো—'

গোঙানির মতো শব্দ করে কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে বুড়ী। লাখপতিয়ার চোখও ভারী হয়ে আসে।

ওধারে ধানোয়ারও মাথার ওপর কম্বল টেনে দিয়েছিল। এমনিতে কোনরকমে একটু শুতে পারলেই মোষের মতো ভোঁস ভোঁস করে তার নাক ডাকতে থাকে। কিন্তু এখন কিছুতেই ঘুম আসছে না।

মাথার ওপর কামার পাখিরা মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে। ধানক্ষেত থেকে ঘুমন্ত গলায় পাহারাদাররা এক একবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে।

'ঘুরে'র আগুন নিভে এসেছিল। উঠে খানকতক শুখা কাঠ তাতে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে ধানোয়ার। কিন্তু এবারও ঘুম আসছে না।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, হঠাৎ পায়ের দিক থেকে একটা ভাঙা ভাঙা জড়ানো গলা কানে আসে 'এ লছমনিয়া—'

লছমন ঘুমজড়ানো গলায় সাড়া দেয়, 'কা রে? হুয়া কুছ?'

'নহী।'

'তবে ঘুমটা ভাঙালি কেন?'

ছনেরি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'আমি একটা কথা ভেবে দেখলাম—'

'কা?' লছমন আগ্রহ দেখায়।

'তু ভাগ যা—'

'ভাগেগা। কায়?'

'কেত্তে রোজ তুই আমাকে পিঠে চড়িয়ে চড়িয়ে ঘুরে বেড়াবি? হামনিকে লিয়ে তুহারকা বহোত তখলিফ—'

'তখলিফ তো কা?'

'ইয়ে ঠিক [illegible]। তু চলা যা—'

'কঁহা যায়েগা ?'

'যাঁহা তুহারকা মর্জি।'

লছমন বলে, 'আমি চলে গেলে তোর কী হবে ?'

ছনেরি বলে, 'বরাতে যা আছে তাই হবে। আমার জন্যে জীওনটা বরবাদ করবি কেন ?'

আরো কী বলতে যাচ্ছিল ছনেরি, তাকে থামিয়ে দিয়ে লছমন বলে, 'চুপ হো, চুপ হো। কী করতে হবে আমি জানি।' বলে মুখের ওপর কম্বল টেনে পাশ ফেরে লছমন।

ছনেরি আর কিছু বলে না। জোরে শ্বাস ফেলে মাথামুখ ঢেকে ঘুমিয়ে পড়ে।

আর পাঁচ হাত তফাতে শুয়ে শুয়ে ধানোয়ার দুই আওরতের কথা ভাবতে থাকে। লাখপতিয়ার বুড়ী সাস সর্বক্ষণ ছেলের বউয়ের দিকে গিধের মতো তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। দিবারাত্রি তার ভয়, এই বুঝি পুতহুটা তাকে ফেলে কোন পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়। আর ছনোর ? এই পঙ্গু বে-সাহারা মেয়েটা তার দুর্বহ ভার থেকে লছমনকে মুক্তি দিতে চাইছে। তার জন্য জগতের কেউ কষ্ট পাক তা সে চায় না।

অসহায় ছনেরির জন্য অপার সহানুভূতিতে মন ভরে যায় ধানোয়ারের। হো রামজী, হো কিষুণজী।

॥ আট ॥

পরের দিন দুপুরে কালোয়া (দুপুরের খাবার) খেয়ে হাভাতের দল আদিগন্ত ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। রোজই এই সময়টা তারা এই ভাবেই ধানকাটা দেখে। আর ভাবে, কবে যে মাঠভরা এত শস্য জমিমালিকের খলিহানে গিয়ে উঠবে! তার আগে তো আর ক্ষেতিতে নামার উপায় নেই।

ধানোয়ার ঝোলা হাতড়ে একটা আধপোড়া বিড়ি বার করে ধরিয়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে অসীম তৃপ্তিতে ফুক ফুক করে টেনে নাকমুখ দিয়ে নীলচে ধোঁয়া বার করছে। তবে রামনৌসেরা, টহলরাম বা অন্য সবার বিড়ির শখ নেই, তামাক আর চুন বাঁ হাতের তেলোয় ডলে ডলে খৈনি বানিয়ে ঠোঁট এবং নীচের পাটির দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিচ্ছে। শুধু পুরুষরাই না, আওরতেরাও। খানিকক্ষণ পর পর পিচিক করে কালচে থুতু ফেলে চারপাশ ভরে ফেলছে।

পরসাদীর কাছে তামাক চুন কিছুই নেই। কিন্তু দশ বছর বয়স থেকেই খৈনি খেয়ে খেয়ে নেশাটা পাকা করে তুলেছে। কেউ খৈনি বানাতে বসলেই সে কাছে গিয়ে হাত পাতে। নেশার জিনিস দিতে কেউ আপত্তি করে না। আজ ফিতুলাল তাকে খৈনি দিয়েছে।

সুরয এখন খাড়া মাথার ওপর নেই। পছিমা আকাশের দিকে খানিকটা নেমে গেছে। শেষ অঘ্রাণের রোদ দ্রুত ঘন হয়ে যাচ্ছে। উত্তুরে হাওয়া ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। এক ঝাঁক জলচর লাল হাঁস বাতাস চিরে চিরে পেছনের বিলের দিকে উড়ে গেল।

অন্য সব দিনের মতোই সামনের পাক্কী দিয়ে লৌরি, বাস, গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি এবং সাইকেল রিকশার স্রোত চলেছে। চারপাশের পৃথিবীতে কিছুই থেমে নেই। মানুষ, পাখি, পোষমানা জানোয়ার থেকে শুরু করে সব কিছুই সরব, সচল। বিপুল বেগে বিশাল পৃথিবী ছুটে চলেছে। শুধু নিশ্চল অনড় কাঁচা সড়কের ধারের কটা ভুখা নাঙ্গা নিরন্ন মানুষ। এই বিপুল বিশ্বে ক্ষেতের পাশে অন্তহীন আগ্রহ নিয়ে অঢেল পাকা ধানের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই যেন।

আচমকা পরসাদী চিৎকার করে ওঠে, 'উই দেখো, দেখো—' বলেই পাক্কীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

সবাই চমকে পরসাদীর আঙুল বরাবর তাকায়। পাকা সড়ক থেকে পনের ষোলজনের একটা দল কাচ্চীতে নেমে এদিকে আসছে।

দেখা মাত্রই টের পাওয়া যায়, ওরা তাদেরই মতো হাভাতে। এ জাতীয় মানুষগুলির গায়ে এমন একটা ছাপ এবং গন্ধ থাকে যে দেখেই চিনে ফেলা যায়।

লাখপতিয়ার শাশুড়ি রোদ ঠেকাবার জন্য ভুরুর ওপর হাত রেখে দেখছিল। হঠাৎ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'নয়া হিস্যাদার। জরুর ভাতের তালাশে এখানে এসেছে। কা হোগা হামনিকো? কেতো ধান মিলেগা এক এক আদমীকো? হো বহু—' ধানের নতুন ভাগীদারদের দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে বুড়ী।

লাখপতিয়া বলে, 'চুপ হো যা! ওরা আসুক না। ডরনেকো কা হ্যায়? বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্য ক্ষেতিতে পাঠিয়ে দেব।'

'যদি না যায়?'

'যাবে যাবে। জরুর যায়েগা। আগের বার যারা এসেছিল তাদের ভাগিয়ে দেওয়া হল না?'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই দলটা এসে পড়ে। এবং কড়াইয়া গাছগুলোর তলাতেই লাখপতিয়াদের কাছাকাছি ঝোলাঝুলি নামিয়ে বসে যায়।

ধানোয়ার দুই হাঁটুর ভেতর খুতনি গুঁজে লোকগুলোকে লক্ষ্য করতে থাকে। পনের ষোলজনের এই দলটার মধ্যে রয়েছে এক সাপুড়ে আর তার এক সঙ্গিনী—খুব সম্ভব জেনানাই হবে। সাপুড়েটা বেজায় ঢ্যাঙা, বাজেপোড়া তালগাছের মতো চেহারা। লালচে জট-পাকানো চুল কাঁধ ছাপিয়ে নেমে এসেছে; মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি। পরনে পোকায়-কাটা জামার ওপর ময়লা ধুলোভর্তি কম্বল আর লুঙ্গি। লোকটার বয়স পঞ্চাশের মতো। দুই পায়ের চামড়া ফেটে ফেটে হাঁ হয়ে আছে। পায়ের চেহারা দেখেই বোঝা যায়, পঞ্চাশ বছরের জীবনে কম করে পঞ্চাশ হাজার 'মিল' সে হেঁটেছে। তার গা থেকে বদবু উঠে এসে আশেপাশের বাতাসে ছড়িয়ে যেতে থাকে। টের পাওয়া যায়, দু-এক বছরের ভেতর সে স্নানটান করে নি।

তার জেনানা রোগা হাড্ডিসার ক্ষয়াটে চেহারার আওরত। মুখ-ভর্তি কালো কালো চেচকের (বসন্ত) দাগ। তার চুলেও স্বামীর মতোই জট পাকিয়ে গেছে। বহুকাল সেগুলোর সঙ্গে তেল জল বা কাকাইয়ের সম্পর্ক নেই। নাকে ছোট চাকার মতো চাঁদির নাথুনি (নথ) ছাড়া সারা গায়ে ধাতুর চিহ্ন নেই। ট্যারাবাঁকা দাঁতে হলুদ রঙের সর পড়ে আছে। তার 'পুরুখে'র মতো তারও গা থেকে কদর্য বদবু উঠে আসছে।

দু'জনেই সাপের ঝাঁপি বাঁকে বসিয়ে কাঁধে করে নিয়ে এসেছে। এর থেকেই আন্দাজ করা গেছে তারা স্বামী-স্ত্রী।

সাপুড়ে ছাড়া আছে এক বান্দরবালা। খাটো চেহারা তার। মাথার মাঝখানটা স্রেফ ফাঁকা; ধার ঘেঁষে কানের ওপর দিয়ে কাঁচা পাকা চুলের ঘের। লম্বা মুখ তার, ঘোলাটে চোখ। শুয়োরের কুচির মতো খাড়া খাড়া দাড়ি গোঁফ। কালো ডোরা দেওয়া সবুজ জামা আর চাপা পাজামা তার পরনে। মাথায় গামছা জড়ানো। তার বাঁদর দুটোর গায়েও মালিকের মতো একই পোশাক। লোকটা নির্ঘাত মাদারী খেলোয়াড় না হয়ে যায় না। বাঁদর ছাড়া তার সঙ্গে রয়েছে পুরনো রঙচটা ঢাউস টিনের বাক্স। ওটা সে মাথায় করে নিয়ে এসেছে। বাক্সটার মধ্যে নিশ্চয়ই তার যাবতীয় সম্পত্তি রয়েছে। তাদের মতো মানুষেরা নিজেদের জাগতিক সমস্ত কিছুই এভাবে কাঁধে চাপিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক টৌন থেকে আরেক টৌনে, এক শস্যক্ষেত্র থেকে আরেক শস্যক্ষেত্রে সুদূর আদিম কোন অতীত থেকে অনবরত ছুটে বেড়াচ্ছে।

ডানদিকের এক জোড়া পুরুষ এবং আওরতও সবার চোখে পড়ছে। বিশেষ করে মেয়েমানুষটার দিকে তাকালে নজর সরানো যায় না। মাজা মাজা গায়ের রঙ, গোল মুখ। না-খাওয়া চেহারা হলে কী হবে, তার তাকানোতে বিজরীর চমক যেন। দুই ভুরুর মাঝখানে সাপের উল্কি। হাতেও নানারকম ছবি আঁকা রয়েছে—

যেমন পাল্কী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তামাটে রুক্ষ চুল চুড়ো করে বেঁধে একটা ভাঙা কাঠের কাকাই গুঁজে দিয়েছে। খাড়া নাক, পাতলা সরু কোমর। পেটে দুবেলা ভাত পড়লে আর শরীরটা ভরে উঠলে তা দিয়ে তুড়ি মেরে মেরে দুনিয়া ছারখার করে দিতে পারত সে।

আওরতটার সঙ্গে যে ভোলাভালা সাদাসিধা চেহারার পুরুষটা রয়েছে, এক নজরেই বোঝা যায় সে একটা আস্ত ভেড়ুয়া। মেয়েমানুষটার হুকুম তামিল করার জন্য সে 'জীওন' পর্যন্ত দিতে পারে।

আর রয়েছে রুখা-শুখা চেহারার আধবুড়ো লম্বা একটা লোক। তার মাথার আধা-আধি সাদা হয়ে গেছে। কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় বসে কোনদিকে তাকাচ্ছে না সে; মুগ্ধ চোখে পলকহীন ধান দেখে যাচ্ছে। আদিগন্ত ধানক্ষেত তাকে মুহূর্তে জাদু করে ফেলেছে যেন।

এ ক'জন ছাড়াও রয়েছে আরো ক'টা পুরুষ এবং বাচ্চা-কাচ্চা সমেত ক'টা মেয়েমানুষ।

মাদারী খেলোয়াড় তার ঝোলা হাতড়ে ঘাটো (মকাইসেদ্ধ) বার করে প্রথমে তার বাঁদরদুটোকে খেতে দেয়। তারপর নিজে একমুঠো মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে ধানোয়ারদের উদ্দেশে বলে, 'কেত্তে রোজ তোমরা এখানে এসেছ?'

কেউ উত্তর দেয় না। দু চোখে তীব্র বিদ্বেষ আর সন্দেহ নিয়ে নতুন দলটাকে দেখতে থাকে।

এদিকে মাদারী খেলোয়াড়ের মতো অন্য পুরুষ এবং মেয়েমানুষগুলো ঝোলাঝুলি খুলে বাসি রুটি, ছাতু ইত্যাদি বার করে খেতে শুরু করেছে। খেতে খেতে আস্তে আস্তে তারা ধানোয়ারদের দেখতে থাকে।

মাদারী খেলোয়াড় ফের জিজ্ঞেস করে, 'কা, জরুর ধানের তালাশে এসেছ?'

কেউ যখন জবাব দিচ্ছে না তখন সবার তরফ থেকে রামনৌসেরাই

বলে ওঠে, 'হাঁ।' এতগুলো মানুষের ভেতর একমাত্র তারই নতুন ভাগীদারদের সম্পর্কে বিরূপতা নেই। জগতের সব কিছুই বিরাগশূন্য শান্ত নিরুত্তেজ মনে সে মেনে নিতে জানে। তার মধ্যকার উদারতা এবং জীবনের নানা অভিজ্ঞতাই তাকে এসব মানতে শিখিয়েছে।

'মালুম হোতা, আভিতক ধান নায় মিলি!'

'ক্যায়সে মিলি! এখনও ধানকাটাই চলছে। সব ধান না উঠলে পেহরাদার পহেলবানেরা কি কাউকে ক্ষেতিতে নামতে দেয়!'

'ও তো ঠিক বাত।' আস্তে আস্তে মাথা দোলায় মাদারী খেলোয়াড়।

একটু চুপচাপ।

তারপর রামনৌসেরা শুধোয়, 'তুমনিলোগ কঁহাসে আতা হ্যায়?'

মাদারী খেলোয়াড় জানায়, তারা কেউ একদিক থেকে আসছে না। কেউ আসছে উত্তর থেকে, কেউ পূব থেকে, কেউ বা পশ্চিম থেকে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় তাদের জান-পরচান হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটা ধানোয়ারদের মতোই।

রামনৌসেরা এবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তো মাদারীকা খেল দেখাও—'

'হ্যাঁ —' মাদারী খেলোয়াড় ঘাড় কাত করে, 'ভারী ভারী গাঁও আউর বড় বড় হাটিয়ায় দেখিয়ে বেড়াই—'

'তা থেকেই তো কামাই হয়?'

চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে মাদারী খেলোয়াড়। তারপর সন্দিগ্ধভাবে বলে, 'তা হয়।'

রামনৌসেরা বলে, 'তা হলে ধানের তালাশে এসেছ কেন?'

'দরকার না হলে কী আর এসেছি? সিরিফ পেটকা লিয়ে—'

রামনৌসেরা জোরে জোরে ঘাড় দোলায়, 'সমঝ গিয়া—'

এধার থেকে সপেরা বা সাপুড়ে হঠাৎ বলে ওঠে, 'হাম্‌নিকো ভি একহী হাল—'

রামনৌসেরা তার দিকে ঘাড় ফেরায়, 'কা ?'

'আমরাও পেটের জন্যেই এসেছি।'

নতুন দলটার বাকী সকলেও এখানে আসার কারণ হিসাবে একই কথা বলে।

গভীর বিতৃষ্ণা নিয়ে ওদের কথা শুনছিল ধানোয়াররা ! আচমকা গালপোড়া টহলরাম বলে ওঠে, 'এ সপেরা ভেইয়া—'

সাপুড়ে লোকটা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কা ?'

'একগো বাত—'

'বাতাও।'

টহলরাম এবার সেই পুরনো যুক্তিটা খাড়া করে যা বলে তা এই রকম। তারা পঁচিশ ছাব্বিশটা লোক আগে থেকেই এসে বসে আছে। তার ওপর নতুন দলটাও যদি থেকে যায় মাথা পিছু ক'টা করে ধানের দানা আর জুটবে ? কাজেই সপেরারা যদি অন্য জমিতে চলে যায় সবার পক্ষেই ভাল। এক জায়গায় পড়ে থেকে কামড়া-কামড়ি করে লাভ নেই। এই যুক্তিতেই আগের একটা দলকে পাক্কীর ওধারে পাঠিয়ে দিয়েছিল তারা। ইত্যাদি ইত্যাদি—

সপেরা পাল্টা যুক্তি খাড়া করে বলে, 'এত্তে বড়ে ক্ষেতি ; কেত্তে কেত্তে ধান হুয়া। হামনিলোগ পন্দর বিশ আদমী ইঁহা রহ যানেসে তুমনিকো কোই নুকসান নায় হোগা—'

টহলরামের পাশ থেকে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ফিতুর্লাল চেঁচিয়ে ওঠে, 'জরুর নুকসান হোগা ! তোমরা পাক্কীর ওধারে চলে যাও না। ওখানে বহোত ধান হয়েছে—'

'নয়া ভেইয়া, আমরা এখানেই থেকে যাই। আমরা এক এক আদমী দশ রোজ বিশ রোজ হেঁটে এখানে এসেছি। আর পা চলছে না।' সপেরা ফিতুর্লালকে বোঝাতে থাকে সুবিশাল এই শস্যক্ষেত্রে ফসল উঠে যাবার পরও যা ঝড়তি পড়তি ধান পড়ে থাকবে

ফির্তুলালেরা পুরো সাল চেষ্টা করলেও সব কুড়িয়ে নিতে পারবে না! সপেরারা ক'টা আদমী থাকলে তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই।

টহলরাম কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হাড্ডিসার সখিলালের রোগা দুবলা বউ সাগিয়া ধারাল সরু গলায় চিৎকার করে, 'নহী, নহী —'

সবাই চমকে ওঠে। সপেরা শুধোয়, 'কা হুয়া?'

'তোমরা এখানে থাকবে না জরুর ইধরসে চলা যাওগে।' আভভি যাওগে —'

শুখা লকড়ির মতো চেহারা সাগিয়ার। সে যে এভাবে চেচাঁতে পারে, আগে টের পাওয়া যায়নি।

নতুন দলটা হকচকিয়ে যায়। কিন্তু সেই আওরতটা যার চোখে বিজরীর চমক, ভুরুর মাঝখানে সাপের উল্কি, এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। মাটিতে সতেজে লাথি মারতে মারতে দু হাত নেড়ে নেড়ে বলে, 'কায়, কায় যাউঙ্গী হামনিলোগ?'

সাগিয়াও দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। কোমরে হাত রেখে ঘাড় বাঁকিয়ে লড়াইয়ের ভঙ্গিতে বলে, 'জরুর যাবি।'

নতুন দলের আওরতটা দৌড়ে এসে সাগিয়ার মুখোমুখি রুখে দাঁড়ায়। তার চোখ দপদপ করতে থাকে। গলার স্বর দশ পর্দা চড়ায় তুলে চিল্লায়, 'কেন যাব, কেন? এটা তোর বাপের জায়গা?'

সাগিয়া তার গলার স্বর আরো উঁচুতে তোলে, 'আমরা আগে এসেছি রে ছুচ্চর রাণ্ডী আওরত। আমরা এখানে থাকব; তোরা ভাগ, ভাগ ইধরসে —'

তু রাণ্ডী, তুলোগনা মাঈ রাণ্ডী, নানী রাণ্ডী। আগে এসেছিস বলে এ জমিন কিনে নিয়েছিস? কুত্তীকা বচ্চে, শাঁখরেল কঁহাকা —'

'তুলোগ শাঁখরেল, তুলোগকা মাঈ, নানী —'

যে শস্যকণা এখনও পাওয়া যায়নি তার আগাম ভাগাভাগি নিয়ে এক দুর্ধর্ষ মহাযুদ্ধের ভূমিকা হিসেবে দুই হাভাতের দলের দুই মেয়েমানুষের মধ্যে অনবরত অশ্লীল খিস্তির আদান প্রদান চলতে থাকে।

দু' জনেই বনভৈসীর মতো ফুঁসছিল। হয়ত পরস্পরের ওপর তারা ঝাঁপিয়েই পড়ত কিন্তু তার আগেই রামনৌসেরা এবং আরো জন কয়েক দৌড়ে এসে তাদের তফাতে সরিয়ে নিয়ে যায়। রামনৌসেরা বলে, 'কা হোতা হ্যায় ? কী করছ তোমরা ? দিমাগ কি বিলকুল গড়বড় হয়ে গেল ? হামনিলোগ ভুখা গরীব আদমী। সবাই এখানে ভাতকে লিয়ে আয়া হ্যায়। নয়া আদমীরা যদি এখান থেকে না যেতে চায়, কী করা যাবে ? রহ্‌নে দো। জবরদস্তিসে কুছ নায় হোগা।'

রামনৌসেরা যা বলেছে তার ভেতর ফাঁক নেই। সত্যিই তো নতুন দলের মানুষগুলো যদি পাক্কীর ওধারে না যেতে চায় জোর জবর-দস্তি করে হটানো যাবে না। সাগিয়ারা কিন্তু খুশী হয় না ; সমানে গজর গজর করতে থাকে।

আর নতুন দলের মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে ঘাড় গুঁজে কিছুক্ষণ কী পরামর্শ করে। তারপর ঝোলাঝুলি কাঁধে বা মাথায় চাপিয়ে দূরে নহরটার ওপারে চলে যায়। ওখানে কয়েকটা সাগুয়ান এবং পরাস গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। দলটা তার তলায় গিয়ে বসে। একেবারে প্রথম থেকেই যাদের এত আপত্তি এত দুশ-মনি তাদের কাছাকাছি থাকা ঠিক নয়।

এদিকে কড়াইয়া গাছগুলোর তলা থেকে নিরুপায় সাগিয়ারা হিংস্র চোখে নতুন মানুষগুলোকে দেখে আর কীভাবে তাদের এই রাজত্ব থেকে ভুচ্চরের ছৌয়াগুলোকে উৎখাত করবে তার পরিকল্পনা করতে থাকে।

॥ নয় ॥

দুপুরে নতুন হাভাতের দলটার সঙ্গে ধানোয়ারদের যে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল তা ক্ষণস্থায়ী। সন্ধের পরই তা মিটে গিয়ে দু পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়। ঘটনাটা এইরকম।

অন্য দিনের মতোই পছিমা দিগন্তের তলায় সুরয ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভৈসা আর গৈয়া গাড়িগুলো আজও ধান বোঝাই করে পাক্কীর দিকে চলে গিয়েছিল। আর আকাশ থেকে পুষ মাসের তীব্র হিম নামতে শুরু করেছিল।

হিমের দাপট থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য যথারীতি 'ঘুর' জ্বালিয়ে নিয়েছে ধানোয়াররা এবং সেটা ঘিরে সবাই গোল হয়ে বসে হাত পা সেঁকছে।

নহরের ওপাশে সাগুয়ান আর পরাস গাছগুলোর তলায় পৌষের গাঢ় কুয়াশাতেও আবছাভাবে আগুন চোখে পড়ছে। বোঝা যায় নতুন দলটাও 'ঘুর' জ্বালিয়ে নিয়েছে।

রাত একটু বাড়লে যখন মাটির গভীর তলদেশে ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত বিলাপ শুরু হয়, সারাদিন ঝিমোবার পর কড়াইয়া আর সীমার গাছগুলোর গোপন গর্তে কামার পাখিরা জেগে উঠে কর্কশ গলায় চেঁচাতে থাকে, ঠিক সেই সময় সাগিয়ার বড় ছেলেটা হঠাৎ পেটে হাত চেপে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়।

সাগিয়া চমকে উঠে ছেলের দিকে ঝুঁকে শুধোয়, 'কা রে, কা হুয়া? হুয়া কা?'

'পেটমে বহোত দর্দ—' বলতে বলতে ছেলেটার ছোট শরীর যন্ত্রণায় বেঁকে যেতে থাকে। মুখচোখ নীল হয়ে যায়।

সাগিয়া এবং সখিলাল ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, 'দর্দ হল কেন? কি রে, কী খেয়েছিলি?'

'কুছ নায়, কুছ নায়। হামনি মর যায়েগা—' ছেলেটার কাতর চিৎকার বাড়তেই থাকে।

সাগিয়া এবং সখিলাল ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। তারা কী যে করবে, বুঝে উঠতে পারে না। আচমকা সাগিয়াও ছেলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মড়াকান্না জুড়ে দেয়। আর সখিলাল উদ্‌ভ্রান্তের মতো একবার রামনৌসেরাকে, একবার লাখপতিয়া এবং তার বুড়ী সাসকে শুধোতে থাকে, দর্দমে বচ্চে মর যাতা। কা করে হামনি? কা করে?'

রামনৌসেরা কী করবে ভেবে পায় না। তাদের ভেতর কেউ বৈদ টৈদ (কবিরাজ) নেই যে 'দাওয়া'র ব্যবস্থা করে ছেলেটার যন্ত্রণা কমিয়ে দেবে। বাচ্চাটার কাছে এগিয়ে এসে তারা অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

এই সময় দেখা যায়, একটা মশাল জ্বালিয়ে নহরের ওধার থেকে কারা যেন এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতে দেখা যায়, ওরা মোট চার জন। তিনটে পুরুষ, একটা আওরত। ওদের মধ্যে সপেরা আর মাদারী খেলোয়াড় ছাড়া সেই লোকটাও রয়েছে, দুপুরে ঝগড়ার সময় যে একটা কথাও বলে নি, সারাক্ষণ মুগ্ধ পলকহীন চোখে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছে। মেয়েমানুষটি হলো সেই ছমকী আওরত; হাত-পা নেড়ে কুৎসিত অশ্লীল গালিগালাজে সে বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছিল।

ওরা যে দৌড়ে আসবে, কেউ ভাবতে পারে নি। রামনৌসেরা অবাক হয়ে শুধোয়, 'তোমরা!'

সপেরা বলে, 'হাঁ। কা হুয়া? কান্না শুনে বসে থাকতে পারলাম না; চলে এলাম।'

রামনৌসেরা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয় কী হয়েছে।

এবার সাগিয়ার ছেলেটাকে ঘিরে বসে সপেরা এবং তার সঙ্গীরা। সেই লোকটা যে দুপুরে জগৎ-সংসার ভুলে ধান দেখছিল, তীক্ষ্ণ চোখে

ছোঁয়াটার পেট টিপে টিপে কী লক্ষ্য করতে থাকে। ছেলেটা যন্ত্রণায় সমানে চিৎকার করে যায়।

রামনৌসেরারা বিপুল আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

লাখপতিয়ার বুড়ী সাস জড়ানো গলায় শুধোয়, 'কা, তুমনি বৈদ হো?'

মুখ না ফিরিয়ে গভীর আত্মবিশ্বাসে লোকটা বলে, 'তা বলতে পার। থোড়াকুছ 'দাওয়া-উয়া' আমি দিতে পারি।'

সাগিয়া লোকটার হাত ধরে বলে, 'ভেইয়া, আমার ছেলেটার দর্দ কমিয়ে দাও। বহোত কষ্ট পাচ্ছে।'

'কোসিস জরুর করেগা।' বলে লোকটা চারপাশের জটলার দিকে তাকায়, 'দুফারে ওধারে একটা জঙ্গল দেখছিলাম। ওখানে যেতে হবে আমার সাথ দু-একজন চল—'

রামনৌসেরা শুধোয়, 'এত রাতে জঙ্গলে কেন?'

লোকটা জানায়, কিছু পাতা এবং শেকড় নিয়ে আসতে হবে। ওষুধের জন্য দরকার। বলে, 'বসে না থেকে জলদি চল।'

লোকটার সঙ্গে সপেরা, মাদারী খেলোয়াড়, সখিলাল, ধানোয়ার এবং সেই প্রচণ্ড ঝগড়াটি মুখরা ছমকী মেয়েমানুষটা পর্যন্ত মশাল নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর মাটির তলা থেকে একটা ছোট গাছের শিকড় আর একটা বুনো লতার গা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে দলটাকে সঙ্গে করে কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ফিরে আসে লোকটা। পাতাগুলোতে উগ্র ঝাঁঝাল গন্ধ। শিকড়টা ছেঁচে কয়েক ফোঁটা রস তক্ষুনি সাগিয়ার ছেলেটাকে খাইয়ে দেয় লোকটা আর এক টুকরো পাথরে পাতাগুলো ঘেটে থকথকে করে পেটে প্রলেপ লাগিয়ে দেয়।

একটু পরেই ছেলেটা হড়হড় করে বমি করে ফেলে। তীব্র গন্ধওলা অজীর্ণ খাদ্য পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

বমিটা হয়ে যাবার পর কষ্ট কমে যায় ছেলেটার। সাগিয়া তার মুখ মুছিয়ে কম্বল দিয়ে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেয়। অনুচ্চ অস্পষ্ট শব্দ করে গোঙাতে গোঙাতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে ছেলেটা।

লোকটা নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে এবার বলে, 'অব্ ঠিক হো যায়েগা।'

রামনৌসেরা জিজ্ঞেস করে, 'কা হুয়া থা বচ্চেকো?'

লোকটা জানায়, নিশ্চয় বহুদিন ছেলেটার পেটে ভাত, রুটি বা ভাল সব্জী পড়েনি। দিনের পর দিন অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে পাকস্থলীর সর্বনাশ হয়ে গেছে। কাজেই সে যা খেয়েছে তা হজম করতে পারছিল না। পেটে প্রচণ্ড দর্দ হচ্ছিল। অজীর্ণ খাদ্য বার না করে দিলে ছেলেটা আরো কষ্ট পেত। দাওয়া দিতে 'উল্টি' (বমি) হয়েছে। এখন নিদটা ভাল হলে সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

লোকটার কাছে সাগিয়া এবং সখিলালের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তার হাত ধরে সখিলাল বলে, 'তুমি না এলে আমার ছৌয়াটা জরুর মরে যেত। তুমি ওকে বাঁচিয়েছ। রামচন্দ্রজী কিষুণজী তোমার ভালাই করবে।'

লোকটা হেসে হেসে এবার যা বলে তা এই রকম। তারাও নিরন্ন ভুখা নাঙ্গা মানুষ, সখিলালরাও তা-ই। একজন বিপদে পড়লে আরেক জনের তো দৌড়ে যেতেই হয়। গুছিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ঠিক এই কথাগুলো সে বলে নি, বা বলতে পারে নি। তার এলোমেলো অবিন্যস্ত কথাগুলো সাজিয়ে নিলে এই রকমই দাঁড়ায়।

এদিকে সাগিয়া সেই মেয়েমানুষটাকে বলতে থাকে, 'তুমি আমার বাচ্চার জন্যে এই জাড়ে কত তখলিফ করলে, অন্ধেরা রাতে 'পুরুখ'-গুলোর সাথ জঙ্গলে 'দাওয়া' আনতে গেলে। আর আমরা কিনা তুফারে বুরা গালি দিয়ে ঝগড়া করে তোমাদের ভাগালাম। মনে গুস্‌সা রোখো না—,

ছমকী মেয়েমানুষটা হঠাৎ খুবই মহানুভব আর উদার হয়ে যায়।

বলে, 'নহী নহী। হুকারকা বাত ছোড় দো। যো হো গিয়া, হো গিয়া —'

রামনৌসেরা সপেরাকে বলে, 'তোমরা আর আমরা একই ধান্দায় এখানে এসেছি। সিরেফ ভাতকা লিয়ে। ফারাকে থেকে কা ফায়দা? তুমনিলোগ ইঁহা চলা আও।'

সপেরা একটু চিন্তা করে বলে, 'ঠিক হ্যায়। লেকেন বহোত রাত হয়ে গেছে। আজ থাক। কাল সুবে সুবে চলে আসব।'

তার দলের বাকী সবাই এতে সায় দেয়। তারপর উঠে নহর পেরিয়ে ওপারে সাওয়ান আর পরাস গাছগুলোর তলায় চলে যায়।

পরের দিন পৌষের সূর্য উঠতে না উঠতেই নহরের ওধার থেকে অস্থায়ী আস্তানা তুলে নতুন হাভাতের দলটা এপারে এসে রামনৌসেরাদের সঙ্গে মিশে যায়।

॥ দশ ॥

নতুন মানুষগুলোর সঙ্গে আলাপ জমে উঠতে দেরি হয় না। একে একে সবার পরিচয়ও জানা যায়।

যে লোকটা বৈদের মতো জঙ্গল থেকে পাতা এবং শেকড় খুঁজে এনে সাগিয়ার ছেলেকে বাঁচিয়েছে তার নাম মুনোয়ারপ্রসাদ। জাতে গাঙ্গাতো; তার বাড়ি কুশী নদীর পাড়ের এক গাঁয়ে। ঝাড়া হাত-পা আদমী; জগৎ-সংসারে তার নিজের বলতে কেউ নেই।

সপেরার নাম জগলাল, তার বউ হল রামিয়া। ছেলেপুলে নেই। বছরের বেশির ভাগ সময় সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখিয়ে এবং পূর্ণিয়ার বাজারে সরকারী অফিসে সাপের বিষ বেচে কোনরকমে পেট চালায়। কিন্তু অঘ্রান পুষ এবং মাঘ, এই তিনটে মাস তাদের কাছে বড়ই দুঃসময়। পৃথিবীর যাবতীয় সাপ এই সময়টা শীতকালীন ঘুমের

জন্য মাটির গভীর তলদেশে চলে যায়। তখন তাদের খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়। এই সময়টা কিছুদিনের জন্য তারা ধানক্ষেতের পাশে এসে বসে। ফসল উঠে যাবার পর যে ঝড়তি-পড়তি শস্য পড়ে থাকে, মাঠকুড়ানিদের সঙ্গে ভিড়ে সে সব কুড়িয়ে নিয়ে যায়। পেটের ব্যাপারে কয়েকটা দিন নিশ্চিন্ত হতে পারা তো সহজ কথা নয়।

মাদারী খেলোয়াড় হরসুখ দোসাদও মুক্ত পুরুষ। দুটো বাঁদর ছাড়া তারও কেউ নেই। হরসুখের ঘর সাহারসার কাছে এক গাঁয়ে। তবে বাপ-নানার ভিটের সঙ্গে তার সম্পর্ক সামান্যই। বাঁদর দুটোকে নিয়ে 'মাদারীকা খেল' দেখাতে দেখাতে এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে এক টৌন থেকে আরেক টৌনে, এক জেলা থেকে আরেক জেলায় টহল দিয়ে বেড়ায়। যেখানে রুজিরোজগার, যেখানে পেটের দানা, সেখানে না গিয়ে উপায় কি? খেলা দেখিয়ে দিনের শেষে কোন গাছের নীচে বা হাটের চালায় চলে যায় তিনজনে। ওখানেই ইট বা পাথরের টুকরো দিয়ে চুলহা বানিয়ে লিট্টি কি চাপটি সেঁকে নেয়। তারপর তিনজনে খেয়ে দেয়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আবার তারা দূর গাঁও কি টৌনে পাড়ি জমায়।

দুই বাঁদর এবং হরসুখের মধ্যে খুবই বনিবনা। তিনজনের সংসারে এক ছিটে অশান্তি নেই। একই খাদ্য তারা ভাগজোখ করে খায়। হরসুখ দু-তিন সাল পর পর লম্বা লম্বা ধারি দেওয়া মোটা কাপড় কিনে নিজের জন্য পা-চাপা পায়জামা আর ঢোলা কামিজ বানিয়ে নেয়। বাঁদর দুটোকে ঐ কাপড়েরই জামা করিয়ে দেয়।

'মাদারীকা খেল' দেখিয়ে সালভর তিনজনের পেট চলে না। আটমাস একরকম কেটে যায়। কিন্তু বাকী চারটে মাস হরসুখদের বড় কষ্ট। বিশেষ করে 'বারীষের' আড়াইটা মাস কামাই একেবারে বন্ধ। মাঠঘাট যখন ডুবে যায়, কাচ্চাগুলো গলে থলে থকথক করে তখন 'মিলের পর 'মিল' দুর্গম পথের কাদা ঠেলে কোথায় যাবে হরসুখ? এই আড়াইটা মাস সাহারসার কাছে বাপ-নানার ছোট্ট

গাঁ ছুখানিয়াতে চলে যায় সে। খোয়াকির জন্য খরচ খরচা করার পর সারা বছরের কামাই থেকে যে অংশটুকু হরমুখ বাঁচায় সেই সঞ্চয় ভেঙে বর্ষার আড়াইটা মাস তাদের চালাতে হয়। বারীষের সময় ছাড়া ধান-কাটার আগের একটা দেড়টা মাসও হরমুখদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। এই সময়টা কিষাণদের হাতে এমন রুপাইয়া-পাইসা থাকে না যাতে মাদারী খেল দেখে সৌখিনতা করবে।

জমানো পয়সা বর্ষার সময় শেষ হয়ে যায়। ধান ওঠার আগে কামাই বন্ধ। তাই দুই পশু আর হরমুখ এই মরসুমে ধানক্ষেতের পাশে এসে হাভাতেদের দলে ভিড়ে যায়। জমিমালিকের খলিহানে ফসল উঠে যাবার পর যে ঝড়তি-পড়তি শস্যকণা মাঠে পড়ে থাকে, হরমুখ আর তার দুই সঙ্গী সেগুলো কুড়িয়ে নেয়। এইভাবে তারা কুড়ি পঁচিশ দিনের খাদ্য জোগাড় করে।

চোখে যার বিজরী-চমক, ভুরুর মাঝখানে সাপের উল্কি, যে ইচ্ছা করলে তুড়ি মেরে মেরে গোটা ছুনিয়াকে নাচিয়ে দিতে পারে সেই ছমকী আওরতটার নাম নাথুনি। জাতে তারাও গাঙ্গাত্তো। তার ভোলাভালা মরদের নাম গৈয়ারাম।

বৈদ মুনোয়ারপ্রসাদ, সপেরা জগলাল, মাদারী খেলোয়াড় হরমুখ দোসাদ এবং নাথুনিরা ছাড়া আর যারা নতুন দলে এসেছে তারা সবাই ভূমিহীন দিনমজুর বা ভিখমাঙোয়া।

অন্য দিনের মতো আজও সকাল হতেই রামনোসেরা সবাইকে তাড়া লাগায়, 'ওঠ, ওঠ সবাই। জঙ্গলে চল—' ইদানীং রোজ সকালে জঙ্গলে যাওয়াটা হাভাতেদের কাছে একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

পুষ বা পৌষ মাসের সুরয আকাশের তলা থেকে সবে উঠে এসেছে। দিগন্তের মাথায় ঘন কুয়াশা পুরু দেয়ালের মতো এখনও অনড়। মাটি থেকে অসহ্য হিম উঠে আসছে ধোঁয়ার আকারে। যে

নিস্তেজ ম্যাড়মেড়ে রোদটুকু উঠেছে, পৌষের হিমার্ত শস্যক্ষেত্র, কুয়াশা, ভেজা গাছপালা বা মাঠঘাটকে উষ্ণ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

দা লাঠি বা টাঙ্গি নিয়ে ধানোয়াররা উঠে দাঁড়ায়।

নতুন দলের একটা আধবুড়ো লোক শুধোয়, 'তোমরা জঙ্গলে যাচ্ছ কেন?'

কারণটা জানিয়ে রামনৌসেরা বলে, 'তোমরাও চল। ধানকাটাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত জিন্দা তো থাকতে হবে।'

'ঠিক বাত।'

নতুন দলের অনেকেই বিপুল উৎসাহে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু বৈদ মুনোয়ারপ্রসাদ, সপেরা জগলাল আর মাদারী খেলোয়াড় হরসুখের জঙ্গলে যাবার চাড় দেখা যায় না। তারা বসেই থাকে।

রামনৌসেরা তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কা, তুমনি-লোগ নায় যাওগে?'

বৈদ মুনোয়ারপ্রসাদ অদিগন্ত ধানক্ষেতের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বসে ছিল। অন্যমনস্কর মতো সে বলে, আমি যাব না ভেইয়া। আমি এখানে বসে বসে ধান দেখব।'

সবাই অবাক হয়ে যায়। ধান কী এমন দেখার বস্তু, তারা ভেবে পায় না। ধানোয়ার শুধোয়, 'ধান দেখবে মতলব—হো বৈদোয়া?' সাগিয়ার ছেলেকে সুস্থ করে তোলার কারণে ধানোয়ারদের কাছে এখন মুনোয়ারপ্রসাদের বিরাট খাতিরদারি। সবাই তাকে বৈদ বলে ডাকতে শুরু করছে।

চোখ না ফিরিয়েই মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'আরে ভেইয়া, এ তো সিধা বাত। কেত্তে রোজ ধান দেখিনি। দেখো দেখো, কেত্তে কিসিমকা ধান! আঁখ ভরকে দেখো—' তার চোখের তারা দুটো যেন স্বপ্নদর্শী হয়ে উঠতে থাকে। গলার স্বরে গাঢ় মুগ্ধতা ফুটে বেরোয়।

ধানোয়ার বলে, 'ধান তো দেখবে। লেকেন খাবে কী? পেটমে কুছ না কুছ তো দেনাই পড়ে।'

মুনোয়ারপ্রসাদ হসে। বলে, 'দো রোজকা লিট্টি আউর ঘাটো হামনিকো সাথ হ্যায়। দো রোজ ধান তো দেখি। উসকা বাদ পেটকা চিন্তা করেগা। হো রামজী, কত দিন পর এত ধান দেখলাম!'

ধানোয়ার ভাবে মুনোয়ারপ্রসাদ লোকটা কি পাগল? অফুরন্ত ধান দেখে তার দিমাগ কি গোলমাল হয়ে গেল? ধানোয়ার অবশ্য এ নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

ওধার থেকে সপেরা জগলাল বলে ওঠে, 'আমিও জঙ্গলে তোমাদের সাথ যাচ্ছি না ধানবার ভেইয়া।'

ধানোয়ার জবাব দেবার আগেই রামনৌসেরা বলে ওঠে, 'কায়?'

জগলাল বলে, 'আমি একটা খুশবু পাচ্ছি—'

'কীসের খুশবু?'

'সাঁপের। ইধর উধর চারপাশে বহোত সাঁপ আছে। এ খুশবু তাদের গা থেকে বেরুচ্ছে।'

'লেকেন—'

'লেকেন কা?'

'জাড়ের সময়, মতলব অঘুন পুষ আউর মাঘ, এই তিন মাহিনা সব সাঁপ তো ধরতীকা নীচামে নিদ যাতা হ্যায়।'

'ঠিক বাত।'

'তা হলে সাঁপের গায়ের খুশবু পেলে কী করে?'

জগলাল একটু হাসে। বলে, 'আমি তো সপেরা। মটির দশ 'মিল' নীচে সাঁপ শুয়ে থাকলেও আমি তার গন্ধ পাই। সমঝা?'

রামনৌসেরা খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, লেকেন –'

'লেকেন উকেন কুছ নহী। তোমরা তো জঙ্গলে যাচ্ছ। ফিরে এসে দেখো দো-চারগো সাঁপ মাটির নীচা থেকে বার করে এনেছি। সাঁপ ছেড়ে এখন আমি জঙ্গলে যেতে পারব না।'

'ঠিক হ্যায়।'

মাদারী খেলোয়াড় হরসুখ জানায়, সেও জঙ্গলে যাবে না। আজ বুধবার। ফী বুধবার এখান থেকে দু 'কোশ' তফাতে নকীপুরায় একটা হাট বসে। বাঁদর নিয়ে সে সেখানে মাদারী খেল দেখাতে যাবে। যদি দো-চারগো নগদ পয়সা মিলে যায় এই আশায় সেখানে যাওয়া। কাল থেকে বরং জঙ্গলে হানা দেওয়া যাবে।

রামনৌসেরা বলে, 'তুমনিকো য্যাইসা মর্জি।'

নতুন দলটার আরো কয়েকজন জানায়, "তারা ভিখমাঙোয়া, খাদ্যের খোঁজে জঙ্গলে যাবে না। নকীপুরার হাটে ভিখ মাঙতে যাবে।

অগত্যা দুইদলের যারা যারা রাজী হল, তাদের নিয়েই রামনৌসেরারা নহর পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

দুপুরে জঙ্গল থেকে ফিরে এসে রামনৌসেরারা দেখতে পায়, মুনোয়ারপ্রসাদ সকালবেলার মতোই ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তবে সপেরা জগলাল আশেপাশে কোথাও নেই। আর নেই হরসুখ এবং তার বাঁদর দুটো। নতুন দলের আরো কয়েকজনকেও দেখা গেল না; তারা নিশ্চয়ই আশেপাশের গ্রাম বা হাটে ভিখ মাঙতে গেছে।

জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল সবার। ভুখে পেট জ্বলে যাচ্ছে। যে যার ঝুলি ঝোলা হাতড়ে মকাই বা গাছের সেদ্ধ-করা মূল টুল বার করে গোগ্রাসে খেতে শুরু করে।

খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে আর সব দিনের মতোই তামাকে চুন ডলে খৈনি বানিয়ে ঠোঁটের তলায় গুঁজে সবাই ধানক্ষেতের দিকে মুখ করে বসে।

ধানোয়ার প্রথম দিন থেকেই মুনোয়ারপ্রসাদকে লক্ষ্য করে আসছে। তাদের মতো হাভাতেদের কাছে জগতের সব চাইতে কাম্য বস্তু হল ধান। তবে এর প্রয়োজন শুধু পেটের জন্য। কিন্তু দিনের

পর দিন ধানক্ষেতের দিকে পলকহীন তাকিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ কী সুখ পায় কে জানে। ধানোয়ার আস্তে আস্তে উঠে এসে তার গা ঘেঁষে বসে।

ঘাড় ফিরিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ অল্প হাসে। বলে, 'তুম?'

ধানোয়ার বলে, 'হাঁ, একগো বাত পুছনে আয়া—'

'কা বাত ভেইয়া?'

'পয়লা দিন থেকেই দেখছি, ধানের দিকে তাকিয়ে আছ। দিনের পর দিন ধান দেখার কী আছে!'

ধানোয়ারের কথা শুনে অবাক হয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ। এরকম আজব প্রশ্ন আগে আর কখনও শোনে নি সে। কিছুক্ষণ পর বলে, 'হো রামজী, তুমি কী বলছ ধানবার ভেইয়া!'

ধানোয়ার শুধোয়, 'খারাপ কিছু বলেছি?'

'আরে ভেইয়া, ইস দুনিয়ামে দেখনেকো এক হী চীজ হ্যায়। আর তা হল ধান। লছমী মাঈ মানুষকে বাঁচাবার জন্যে এই দুনিয়ার ক্ষেতিতে ক্ষেতিতে ধানের জনম দিয়েছেন। ধান পয়দা না হলে কী হতো বল তো? তুমি আমি কেউ বেঁচে থাকতাম?'

মুনোয়ারপ্রসাদ এরপর আরো যা বলে যায় তা এইরকম। ধান না ফললে ভগোয়ানের সেরা সৃষ্টি মানুষের বিনাশ ঘটে যেত। চিরকাল জগৎকে যা রক্ষা করে আসছে সেই ধান ছাড়া আদমী লোগনের দেখার আর কিছু নেই।

ধানোয়ার কিছু না বলে তাকিয়েই থাকে।

মুনোয়ারপ্রসাদ অনবরত বলেই যায়, 'কত কিসিমের ধান আছে জানো?'

'হোগা দো-পাঁচ কিসমকা—'

'নহী।'

'তব্?'

'কমসে কম দো পানশো (দু-পাঁচ শো) কিসিমকা—'

'হাঁ ?'

'হাঁ।'

'তুমি সব ধান চেনো ?'

'জরুর।' হাতের একটা মাপ দেখিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'যখন আমি এইরকম বচ্চে ছিলাম তখন থেকে ধান দেখে আসছি। চোখ বুজে ধানের গায়ে হাত দিয়ে বলে দিতে পারি, ওটা কোন জাতের ধান। সমঝা ?

'বল কী!' ধানোয়ার একেবারে হাঁ হয়ে যায়।

'ঠিকই বলছি ভেইয়া।'

একটু চিন্তা করে ধানোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের অনেক ক্ষেতিউতি ছিল—না ?'

প্রশ্নের রকমটা বুঝতে না পেরে মুনোয়ারপ্রসাদ শুধোয়, 'মতলব ?'

'সিধা মতলব। বহোত জমিন ছিল তোমাদের, সেখানে হরেক কিসিমের ধান ফলত। বচপন থেকে দেখে দেখে ওগুলো চিনেছ।'

মুনোয়ারপ্রসাদ হঠাৎ শব্দ করে হেসে ওঠে, 'নহী নহী, একটুকরো জমিনভি হামনিকো নহী থা। হামনিকো বাপ থা বান্ধুয়া কিষাণ। পরের ক্ষেতিতে বেগার দিয়ে দিয়ে জান চৌপট করে ফেলেছে। আমারও বেগার খাটার কথা ছিল। লেকেন ভাগকে আয়া। বেগারি আমি দিতে পারব না।'

'তব ?'

'পরের ক্ষেতিতে ধান দেখে দেখে আমি চিনে নিয়েছি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মুনোয়ারপ্রসাদ গভীর গলায় বলে ওঠে, 'জানো ভেইয়া, ধান দেখে দেখে আমি সারা জীওন কাটিয়ে দিতে পারি।'

ধানোয়ারের মনে হয়, মুনোয়ারপ্রসাদ মিথ্যে বলেনি। তার কথার প্রতিটি অক্ষরই বিশ্বাসযোগ্য। এমন লোক সে আগে আর কখনও দেখেনি।

কী ভেবে মুনোয়ারপ্রসাদ এবার বলে, 'ভেইয়া, এখানে বসে থেকে কী হবে। চল, ক্ষেতির কাছে গিয়ে ধান দেখি। যাবে?'

রুখা-শুখা চেহারার আধবুড়ো লোকটা ধানোয়ারকে ভেতর থেকে টানছিল যেন। সে বলে, 'যাব। চল, তোমার কাছ থেকে ধান চিনে নিই।'

দু'জন কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা থেকে উঠে পড়ে।

॥ এগার ॥

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, ধানক্ষেতের ধার ঘেঁষে যে কাঁচা সড়ক জঙ্গলের দিকে চলে গেছে সেটা ধরে মুনোয়ারপ্রসাদ এবং ধানোয়ার অনেকটা এগিয়ে গেছে। নীচের ক্ষেতিগুলোতে পুরোদমে ধানকাটাই চলেছে। রোজকার মতো পহেলবানেরা এ ক্ষেতি থেকে ও ক্ষেতিতে টহল দিয়ে দিয়ে তদারকি করে বেড়াচ্ছে। গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি-গুলো আলের ধারে অলস ভঙ্গিতে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুনোয়ারপ্রসাদ সামনের একটা জমির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'এই যে ধান দেখছ, এর নাম হল আদারিয়া মোরি। আদ্রা নচ্ছত্রকা (নক্ষত্র) নাম শুনা হ্যায়?'

ধানোয়ার মাথা নাড়ে, 'শুনা—

'আদ্রা নচ্ছত্রে এই ধান রোয়া হয়েছিল বলে এর নাম আদারিয়া মোরি। আর ঐ যে ধান দেখছ—' এবার ডান পাশের ক্ষেতিটা দেখিয়ে দেয় মুনোয়ারপ্রসাদ।

'হাঁ, কহো—'

'ওগুলো রোহনয়া মোরি। আদারিয়া মোরির মতো বিলকুল একরকম দেখতে; শুধু থোড়েসে লম্বা। রোহণ (রোহিণী) নচ্ছত্রে এই ধান রোয়া হয়েছিল বলে এমন নাম হয়েছে।'

দুই ধানের মধ্যে তফাত সামান্যই। অনেকক্ষণ লক্ষ্য না করলে বোঝাই যায় না। মুনোয়ারপ্রসাদের নজরের তীক্ষ্ণতার রীতিমত অবাকই হয়ে যায় ধানোয়ার। সে আস্তে আস্তে মাথা দোলায়, 'সমঝা—'

পাশাপাশি দুই ধানক্ষেত পার হয়ে ওরা আরেকটা জমির কাছে এসে পড়ে। এখানকার ধান দেখিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'এ হল সারহাট্টি। গায়ে রং দেখছ তো; মোমফালির ওপরকার মতো রং?'

'হাঁ—' ধান দেখতে দেখতে জবাব দেয় ধানোয়ার।

'অন্দরে আছে বড় বড় দানা। এই চালের ভাত খেতে ভাল না, রুখা লাগে। তবে এ দিয়ে লোকে মুড়ি বানায় বেশি।'

পর পর অনেকগুলো জমিতে দেখা যায় সারহাট্টি পেকে আছে। সেগুলো পেরিয়ে যেতে যেতে ছড়া কাটে মুনোয়ারপ্রসাদ:

'এক মণ খরিহান (খরচ),
এক মণ বিহান (বিঘা)।'

ধানোয়ার শুধোয়, 'ইসকা মতলব?'

মুনোয়ারপ্রসাদ বুঝিয়ে দেয়, এক মণ সারহাট্টি রুইতে কিষাণকে এক মণ নগদ মজুরি দিতে হয়।

এ খবর জানা ছিল না ধানোয়ারের। সে বলে 'তাই নাকি?'

'হাঁ।'

সারহাটির ক্ষেতগুলো পেছনে ফেলে একটা জমির মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ। এখানকার ধান দেখিয়ে সে শুধোয়, 'এগুলো চেনো?'

ধানোয়ার মাথা নেড়ে জানায়—চেনে না।

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'এ হল সাঠি ধান। দেখো দেখো, পাতার ভেতর শীষগুলো ছুপে আছে। বাইরে থেকে দেখা যায় না—'

আরে তাই তো, এমন ধান আগে আর কখনও দেখেনি ধানোয়ার। এক সময় তার গোপন অহঙ্কার ছিল, এই পৃথিবীতে

খাওয়ার উপযোগী লতা পাতা, গাছের মূল, কন্দ, পশুপাখি এবং নানা ঋতুর শস্য তার মতো কেউ চেনে না। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা বছর অবিরাম খাদ্যের পেছনে ছুটে ছুটে এসব চিনে ফেলেছে সে। মুনোয়ার-প্রাসাদের সঙ্গে দেখা না হলে সেই অহঙ্কার তার অটুটই থাকত। কিন্তু এই আধবুড়ো দুবলা কমজোরি লোকটার সঙ্গে ধানক্ষেতের ধার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হয়, এই পৃথিবীর অনেক কিছুই তার জানা বা শেখা হয়নি; বিশেষ করে ধানের ব্যাপারটা। মুনোয়ার প্রসাদকে যত দেখছে ততই বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে ধানোয়ারের। এমন মানুষ আগে আর কখনও তার নজরে পড়েনি।

মুনোয়ার প্রসাদ বলতে থাকে, 'এই ধান বেশি ফলে না। এর থেকে যে চাউর হয় তা কী কাজে লাগে জানো?'

ধানোয়ার বলে, 'নহী তো—'

'বৈদরা (কবিরাজ) এ দিয়ে দাওয়া বানায়।'

সাঠি ধানের ক্ষেত পার হয়ে দু'জনে যে ক্ষেতিটার কাছে আসে সেখানকার লম্বাটে ধানগুলো আর চেনাতে হয় না ধানোয়ারকে। এই ধান তার চেনা।

ধানোয়ার বলে, 'এ তো পূর্বী কেলাসর—না?'

মুনোয়ারপ্রসাদ তারিফের ভঙ্গিতে বলে, 'তুমি চেনো দেখছি। এই চালের মাড়ভাত্তা কভি খায়া?'

'খায়া হ্যায়।'

'ক্যায়সা?'

নেহাত পেট ভরাবার জন্যই আজন্ম খেয়ে আসছে ধানোয়ার। কোন কিছু তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে তার আস্বাদ জিভে এবং স্মৃতিতে ধরে রাখার মতো পর্যাপ্ত সময় বা সৌখিনতা, কোনটাই তার নেই। কেননা দুপুরে কিছু জুটলে সেটা খেয়েই রাতের খাদ্যের খোঁজে তাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়। চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর ধরে অবিরাম ছোটাছুটির জন্য কোন খাবার সম্পর্কেই আলাদাভাবে সে নজর দিতে

পারে নি। খাদ্য তার কাছে উপভোগ করার বস্তু নয়। নিতান্তই বেঁচে থাকার জন্য জরুরী।

ধানোয়ার বলে, 'মালুম নহী—'

চোখ বুজে মুখের ভেতর পূর্বী কেলাসর চালের গরম মাড়ভাতার স্বাদ যেন অনুভব করতে থাকে মুনোয়ারপ্রসাদ। বেশ কিছুক্ষণ পর জিভ এবং আলটাকরায় অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে চোখ মেলে বলে, 'বহোত মিঠি ভাত্তা। এ ভাত খেতে পেলে পরমাত্মাকা শান্তি—'

ধানোয়ার অবাক হয়ে শুধোয়, 'হাঁ ?'

'হাঁ ভেইয়া।'

এরপর সাদা রঙের সেহ্‌লা, লাল রঙের মনসরা, মোটা দানার বারাঠি, সরু 'দানার লাল দৈয়া, হাল্কা সাদা রঙের গজমুক্তা—বিপুল উৎসাহে এবং আবেগের গলায় এমন নানা জাতের, নানা রঙের, নানা আকারের কত যে ধান দেখিয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ তার হিসাব নেই। এই সব ধান কখন কোন তিথিতে কীভাবে রোয়া হয়, সমস্ত কিছু তার মুখস্থ। শুধু তাই না, কোন ধানের ভাতে, চিড়েতে বা মুড়িতে কীরকম আস্বাদ, সব তার জিভে লেগে আছে। ধান নামে পৃথিবীর এই প্রাচীন শস্যের দানাগুলি মুনোয়ারপ্রসাদের কাছে প্রিয় সন্তানের মতো। সে তাদের যাবতীয় খবর রাখে।

ধান চেনাতে চেনাতে কখন যে ধানোয়ারকে নিয়ে মুনোয়ার-প্রসাদ ধানক্ষেতে নেমে অনেকটা ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল, কারো খেয়াল নেই।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা জমির পাশে আলের ওপর দাঁড়িয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ। ডাকে, 'ধানবার ভেইয়া—'

তক্ষুনি সাড়া দেয় ধানোয়ার 'কা ?'

জমিটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'এই ধান চেনো ?'

'নহী।'

গলার স্বরে বিপুল আবেগ ঢেলে মুনোয়ারপ্রসাদ বলে,'দুনিয়াকা সবসে বঢ়িয়া ধান।'

'হাঁ?'

'হাঁ ভেইয়া। তুলসীমঞ্জুরী ধানকা নাম কভী শুনা হ্যায়?'

মুনোয়ারপ্রসাদ ঘাড় কাত করে ধানোয়ারের দিকে তাকায়।

ধানোয়ার মাথা হেলিয়ে দেয়, 'শুনা হ্যায়।'

'আমাদের এই মুলুকে তুলসীমঞ্জুরীকে কী বলে জানো?'

'নহী।'

'নানকী বাসমতী।' বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে মুনোয়ার-প্রসাদ। তারপর উঁচু আল থেকে ক্ষেতিতে নেমে যায়। ধানের একটা মোটা শীষ হাতের ভেতর নিয়ে বলে, 'চিনে রাখো ধানবার ভেইয়া। কালে কালে ছোটা ছোটা দানা—'

গভীর আগ্রহে ঝুঁকে শীষটা দেখতে থাকে ধানোয়ার।

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে যায়, 'এই ধানসে যে চাউর মেলে তা ফোটালে এমন খুশবু বেরোয়, কী বলব। এ দিয়ে যদি ক্ষীর (পায়েস) বানিয়ে খাও, মনমে বহোত সুখ হো যায়গা। নানকী বাসমতীকা ক্ষীর খায়া কভী?'

'নহী—' ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকায় ধানোয়ার 'বছরে সাত মাহিনা ভাত খেতে পাই না, ক্ষীর কিধরসে মিলি!'

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, পন্দর সাল আগে মাধেপুরে এক রাজপুত ছত্রিয় (ক্ষত্রিয়) বড়া আদমীর বাড়ি নানকী বাসমতীর ক্ষীর খেয়েছিলাম। এখনও জিভে লেগে আছে—' বলে আলটাকরায় জিভ ঠেকিয়ে শব্দ করে সে। পনের বছর আগের পায়েস খাওয়ার সেই পরম সুখকর স্মৃতি মুখের ভেতর নতুন করে অনুভব করতে করতে আরামে তার চোখ বুজে আসে।

মুনোয়ারপ্রসাদ চোখ বুজেই আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার

আগেই মাঠের ওধার থেকে হৈচৈ এবং চিৎকার শোনা যায়, 'এ-এ এ-এ-এ—,

চমকে সামনে তাকায মুনোয়ারপ্রসাদ আর ধানোয়ার। তিন চারটে পহেলবান লাঠি বাগিয়ে বনভৈসের মতো তাদের দিকে দৌড়ে আসছে ?

ধানোয়ার ভীষণ ভয় পেয়ে যায় বলে, 'মুনবার ভেইয়া—'

মুনোয়ারপ্রসাদ শুধোয়, 'কা ?'

'পহেলবানজীরা হোঁশিয়ার করে দিয়েছিল, সব ধান ওঠার আগে যেন ক্ষেতিতে না নামি। অব্ কা হোগা ?'

মুনোয়ারপ্রসাদ ভেতরে ভেতরে দমে গিয়েছিল। তবে বাইরে তা ফুটে উঠতে দেয় না। বলে, 'কুছ নায় হোগা।'

'চল, ভেগে যাই।'

'ভাগনেকো জরুরত নহী। ভেগে যাবই বা কোথায় ? ওরা ঠিক ধরে ফেলবে। ইধরিই খড়া রহো—'

দু'জনে দাঁড়িয়েই থাকে। এদিকে পহেলবানেরা কাছে এসে পড়েছে। বিশাল চেহারার এক পহেলবান মাটিতে প্রচণ্ড জোরে লাঠি ঠুকে গর্জে ওঠে, 'কা রে ভূচ্চরের ছৌয়ারা, ক্ষেতি থেকে সব ধান উঠে গেছে।'

'নহী পহেলবানজী—' মুনোয়ারপ্রসাদ এবং ধানোয়ার একই সঙ্গে জানায়।

'তবে ক্ষেতিতে ঢুকেছিস কেন ?'

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে,'কোন কসুর করিনি পহেলবানজী। ধানবার ভেইয়া তো সব কিসিমের ধান চেনে না। আমি ওকে চেনাবার জন্যে জমিতে নিয়ে এসেছিলাম।'

ঢ নম্বর পহেলবান গর্জে ওঠে, 'ঝুট।'

'নায় পহেলবানজী, সচ।'

জরুর তোদের দুসরা কোঈ ধান্দা হ্যায়।'

'ধানোয়ার বলে, 'নহী, নহী –'

তিন নম্বর, পহেলবান এবার বলে, 'সচমুচ বাতা, কোথায় ধান চুরি করে রেখেছিস?'

ধানোয়ার এবং মুনোয়ারপ্রসাদ সমস্বরে বলে, 'ধান চুরায়া নহী পহেলবানজী। ভগোয়ান রামজী কিষুণজী কসম—'

'দেখি তোদের কাপড়া-উপড়া—'

'হাঁ হাঁ জরুর। দেখিয়ে না।'

মুনোয়ারপ্রসাদ আর ধানোয়ার পরনের কাপড় ঝেড়ে ঝুড়ে দেখায়। কিন্তু পহেলবানগুলোর পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না। তারা দু'জনের শরীরের নানা খাঁজে হাত ঢুকিয়ে তল্লাশী চালায়। তারপর পেতলের গুল-বসানো লাঠির ডগা ধানোয়ার আর মুনোয়ারপ্রসাদের পেটে গুজে ঠেলতে ঠেলতে কাঁচা সড়কের দিকে নিয়ে যায়।

এক পহেলবান বলে, 'জরুর ধান চুরাবার মতলবে এসেছিলি।'

'অ্যাযসা বুরা ধান্দা আমাদের ছিল না।' মুনোয়ারপ্রসাদ বলে।

'শালে, সাধু-মহাত্মার দল। গিদ্ধড়ের ছোয়ারা, ধান দেখতে এসেছিল! ক্যা, ধান দেখনেকো চীজ!'

মুনোয়ারপ্রসাদ ধানোয়ারকে যা বলেছিল, এবারও তাই বলে। অর্থাৎ এত বড় পৃথিবীতে ধান ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই।

'ধান দেখাচ্ছি তোকে।'

জোরে ঠেলতে ঠেলতে একসময় দু'জনকে কাচ্চীতে এনে তোলে পহেলবানেরা। তারপর প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয় এবং লাঠি দিয়ে হাতে-পায়ে পিঠে-বুকে গোটাকতক বাড়ি বসিয়ে দেয়। একটা লাঠি পড়ে মুনোয়ারপ্রসাদের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট আর নাক কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে।

পহেলবানেরা শাসায়, আজ বিশেষ কিছুই করা হল না। কিন্তু এরপরও যদি ধানোয়ারদের ধানক্ষেতে দেখা যায়, তা হলে আর ছাড়া হবে না; একেবারে খতম করে নহরের পাঁকে পুঁতে ফেলা

হবে। শাসানির পর আর দাঁড়ায় না পহেলবানেরা; ক্ষেতিতে নেমে যায়।

হাতের পিঠে রক্ত মুছতে মুছতে উঠে বসে মুতোয়ারপ্রসাদ। বলে, 'একগো ধানও নিই নি; সিরিফ দেখতে গিয়েছিলাম। তবু মার খেতে হল। হো ভগোয়ান—'

ধানোয়ার হঠাৎ ক্ষেপে যায়। পহেলবানদের উদ্দেশে বারকতক থুতু ফেলে সে—'থুক, থুক, থুক। তারপর বলে, 'কুত্তা, ভুচ্চর জানবর—'

॥ বার ॥

আজ সকালে খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে নতুন দলের নাথুনির সঙ্গে লাখপতিয়ার তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। ঘটনাটা এই রকম।

ইদানীং ফল পাকড়, লতাপাতা বা খাওয়ার মতো পাখির খোঁজে সবাই একসঙ্গে জঙ্গলে যায় না। দু দলে ভাগ হয়ে একদল যায় জঙ্গলে, আরেক দল নহরের ডান দিকের বিলে।

আজ সকালে রোদ ওঠার পর কিছু খেয়ে রামনৌসেরা পনের কুড়ি জনকে নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। আর ধানোয়ারের সঙ্গে পনের ষোলজন যায় শীতের মজা বিলে।

মাদারী খেলোয়াড় হরসুখ তার দুই বাঁদর নিয়ে মাধেপুরের হাটে বেরিয়ে পড়ে। সাপেরা জগলাল এবং তার জেনানা পাক্কীর কাছাকাছি সাপের গর্ত খুঁজতে থাকে। অনেকেই আশেপাশের গাঁ এবং টৌনগুলোতে ভিখ মাঙতে যায়। ভিখমাঙোয়াদের এই এক স্বভাব, কিছুতেই খেটেখুটে পেটের দানা জোটাতে চায় না। হাত পাতলে যদি পাওয়া যায়, কে আর খাটে!

যাই হোক, ধানোয়ারের সঙ্গে রয়েছে টহলরাম আর তার জেনানা,

ফতু লাল, সোমবারী, এমনি অনেকে। আর আছে লাখপতিয়া। সেই প্রথম দিন থেকেই লাখপতিয়া যেন তার গায়ের সঙ্গে জুড়ে আছে। ধানোয়ার জঙ্গলে গেলে সে জঙ্গলে যাবে, ধানোয়ার বিলে গেলে সে সেখানে গিয়ে হাজির হবে। এমন কি রাতে 'ঘুরে'র আগুন জ্বালিয়ে যখন তার চারপাশে সবাই গোল হয়ে ঘুমোয়, লাখপতিয়া তার বুড়ী সাসকে নিয়ে ধানোয়ারের কাছাকাছিই শোয়।

লাখপতিয়া ছাড়া সেই ছমকী আওরতটা—যার নাম নাথুনি, যার মাথায় তেলহীন তামাটে চুল, যার ভুরুর মাঝখানে সাপের উল্কি, যার চোখে বাজপাখির নজর, একটু মাংস লাগলে যার জওয়ানি গদরাই হয়ে উঠত—সেও এসেছে। তার ভোলাভালা মরদ অবশ্য আসতে পারে নি। পৌষমাসের হিমবর্ষী আকাশের নীচে পড়ে থেকে তার জ্বর এসে গেছে। দু'রাত সমানে কাশছে সে। শরীর তার এতই দুব্‌লা হয়ে গেছে যে হাঁটতে গেলে পা টলে যায়। তাই দু-তিন দিন ধরে সে খাদ্যের তালাশে বেরুতে পারছে না; কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলাতেই চুপচাপ পড়ে থাকছে।

ধানের আশায় পূর্ব বিহারের এ দিকটায় আসার পর থেকে ধানোয়াররা বেশিরভাগ দিনই জঙ্গলে গেছে। আজ নিয়ে বিলে নেমেছে মোটে তিন দিন।

সুরয পুবের আকাশে বেশ খানিকটা উঠে এসেছে, শীতের নিরুত্তাপ রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

এর মধ্যেই সেই বুড়ো ভৈসোয়ারটা তার গণ্ডা তিনেক মোষ নিয়ে বিলে চরাতে এসেছে। রোজ সকাল হতে না হতেই বুড়োটা তার মোষের বাহিনী নিয়ে বিলে নেমে পড়ে। সূর্য ওঠার মতো এটা যেন অনিবার্য একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ধানোয়ারদের। এ ক'দিনে সে বুঝে ফেলেছে এরা ধানকুড়ানির দল। প্রথম দিন যখন ধানোয়াররা জঙ্গলে যায়, বুড়ো ভৈসোয়ার তাদের সাবধান করে দিয়েছিল। ঐ একটা দিন ছাড়া সে

তাদের সঙ্গে আর কোনদিন কথা বলে নি; নিরাসক্ত উদাসীন চোখে রোজই একবার ধানোয়ারদের তাকিয়ে দেখে শুধু।

কাঁচা সড়কের নীচে যেখান থেকে বিল শুরু সেখানে একটা প্রকাণ্ড মোষের পিঠে চড়ে বুড়ো ভৈসোয়ার তার জন্তুগুলোকে চরাচ্ছিল। যে মোষটার ওপর বুড়ো বসে আছে তার কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। সত্তর আশী কি একশো বছরের একটা মানুষের ভার তার কাছে নেহাতই তুচ্ছ। আপনমনে জন্তুটা শিশিরে ভেজা শীতের ঘাস খেয়ে চলেছে। ভৈসোয়ারের কাঁধের ওপর বসে আছে একটা চোটা পাখি। পাখিটার ভয়ডর নেই বা ভৈসোয়ারকে সেটা গ্রাহ্যই করে না।

আজও ধানোয়াররা কাচ্চী থেকে বিলের শুকনো মাটিতে নেমে বুড়ো ভৈসোয়ারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। বুড়ো উদাসীন ঘোলাটে চোখে একবার তাদের দিকে তাকিয়েই অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

শুকনো কাশের বন আর ছোট ছোট বন-ঝাউয়ের ঝোপগুলোর ভেতর দিয়ে ধানোয়াররা হাঁটতে থাকে এখানে ওখানে রঙীন ধাতুপ ফুল ফুটে আছে। ফুটে আছে অজস্র মনরঙ্গোলি এবং সফেদিয়া ফুল। দু একটা গোঁড়ালেবুর গাছও চোখে পড়ে। সেগুলোর ডালে বিরাট আকারের সবুজ লেবু ফলে আছে আর আছে গুড়মি ফলের গাছ- আর কুলের জঙ্গল। এক ধরনের বুনো কাঁটার ঝোপও নানা গাছ গাছালির ফাঁকে মাথা তুলেছে। এই শীতকালে কাঁটাগাছগুলোতে বেগুনি রঙের প্রচুর ছোট ছোট ফুল ফোটে। তবে সব কিছু ছাপিয়ে যা বেশি করে চোখে পড়ে তা হল দীর্ঘ বুনো ঘাস।

চলতে চলতে কেউ কেউ পাকা টক কুল পেড়ে নিচ্ছে। কেউ ছিঁড়ে নিচ্ছে দু-একটা গুড়মি ফল। গুড়াম খেতে ভাল লাগে না। কিন্তু হাভাতেদের কাছে জিভের স্বাদ বড় ব্যাপার নয়, পেট ভরানোটাই আসল কথা।

বিলের যে জায়গাগুলোতে অল্প অল্প জল এখনও রয়েছে সেখানে

এই সাকালবেলাতেই ঝাঁঝে ঝাঁকে কুল্লো, কাঁক আর মানিকপাখি এসে পড়তে শুরু করেছে। দু-চারটে লাল হাঁসও চোখে পড়ছে।

ধানোয়াররা একটা জলা জায়গা দেখে তার পাড়ে এসে দাঁড়ায়। এখানে জল প্রায় দেখা যায় না বললেই হয়। কচুরিপানায় সব ঢেকে আছে। নানা জাতের পাখি কচুরিপানার ওপর বসে এই মুহূর্তে পৌষের রোদ পোহাচ্ছে। ধানোয়ারদের লক্ষ্য এই সব পাখির সুস্বাদু মাংস।

ধানোয়াররা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে থেকে পাখিগুলো অনেকটা দূরে। জল যদিও শুকিয়ে গেছে তবু কমসে কম কোমর সমান তো হবেই. কচুরিপানা ঠেলে পাখিগুলোর কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ওরা আর থাকবে না, সব ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাবে।

ধানোয়ার জিভ দিয়ে চক চক করে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বলে, 'বিলকুল ভুল হো গিয়া—'

লাখপতিয়া এবং আরো দু-চারজন তার পাশ থেকে বলে ওঠে, 'কা হুয়া ?'

'খালি হাতে পাখি মারা যাবে না। ওদের কাছে গিয়েও কোঈ ফায়দা নহী। যাবার আগেই ওরা পালাবে। কাল রাত্তিরে যদি ফান্দা (ফাঁদ) পেতে রেখে যেতাম, ভাল হত।'

নাথুনি শুধোয়, 'তা হলে এখন কী করবে ? হামনিলোগ লৌট যায়েগী ?'

'নহী। এতদূর এসে কিছু না নিয়ে ফিরব না। থোড়া সোচনে দো হামনিকো।'

খানিক্ষণ কী চিন্তা করে ধানোয়ার বলে, 'এক কাম করো—'

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। শুধোয়, 'কা ?'

আগে থেকেই অগুনতি পাখি রয়েছে। রোদ যত চড়ছে ততই আরো নতুন নতুন পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে কচুরিপানার ওপর বসছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে ধানোয়ার বলে, 'বহোতসে পঞ্ছী হ্যায়।'

'হাঁ—'

'ইটা ফেকো। দু-চারটের গায়ে জরুর লেগে যাবে। জখম হলে ওরা উড়তে পারবে না। তখন ধরে ফেলা যাবে।'

ধানোয়ারের পরিকল্পনা মোটামুটি সবার পছন্দ হয়। এক মুহূর্তও নষ্ট না করে সবাই বিলের পার থেকে মাটির ডেলা বা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু এতদূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে পাখিগুলোকে জখম করা সহজ নয়। মাঝখান থেকে পাখিগুলো ভয় পেয়ে বেজায় চেঁচামেচি জুড়ে দেয় এবং ডানা ঝাপটে উড়ে উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ধানোয়াররা যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে, বেশির ভাগ পাখিই তার উল্টোদিকে উড়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। তবে দু-চারটে সন্ত্রস্ত পাখি এধারেও এসে পড়েছে। তাদের লক্ষ্য করে ধানোয়াররা অনবরত ঢিল ছুঁড়ে যায়। কিন্তু তাড়াহুড়ো করায় কোন ঢিলই পাখিদের গায়ে লাগে না। তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে বাতাস চিরে দিগন্তের দিকে পালাতে থাকে। গোটা আকাশ জুড়ে নানা রঙের পাখির ডানা যেন রঙের ফোয়রা ছড়িয়ে দেয়।

হাতের সামনে এত অজস্র সুস্বাদু খাদ্য কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেল না।

হাভাতের দল মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বলে, 'ভুচ্চরগুলো ভেগে গেল। একটাকেও জখম করতে পারলাম না—'

ধানোয়ার বলে, 'এভাবে হবে না। আজ রাত্তিরে ফন্দা পেতে যাব। শালে পঞ্ছীরা কীকরে তখন ভাগে দেখব—'

সোমবারী বলে, 'পঞ্ছী যখন মিলল না, তখন বাথুয়া শাক, গুড়মি ফল আর লাল্সা পিঁপড়ের ডিম নিয়ে যাই। পেটমে কুছ তো দেনাই পড়ে।'

রামিয়া বলে, 'মছলি ভি পাকাড়না পড়ে।' অর্থাৎ বিলে নেমে মাছেরও সন্ধান করতে হবে।

অনেকেই সায় দেয়, 'হাঁ-হাঁ - '

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই একটা দলছুট ভীরু সিল্লী অনেক নীচু দিয়ে প্রায় ধানোয়ারদের মাথা ছুঁয়ে কুঁক কুঁক করতে করতে পুরদিকে উড়ে যেতে থাকে। যে কোন কারণেই হোক সিল্লীটা এতক্ষণ বিলেই ছিল ; তার দলের সঙ্গে যেতে পারে নি।

হাভাতেরা কেউ তৈরী ছিল না। তাদের মনে হয়ে ছিল, বিলের জল থেকে সব পাখি উড়ে গেছে। কিন্তু লাখপতিয়া এবং নাথুনির হাতে দুটো পাথরের টুকরো থেকে গিয়েছিল। চোখের পাতা পড়বার আগেই তারা পাথর ছোঁড়ে এবং একটা পাথর লক্ষ্যভেদ করে ফেলে। জখমী সিল্লীটা তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে হাওয়ায় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ঘাড় গুঁজে দূরে কাশের জঙ্গলে গিয়ে পড়ে।

তক্ষুনি দুই আওরত অর্থাৎ নাথুনি তার লাখপতিয়া উর্ধ্বশ্বাসে কাশবনের দিকে ছুটে যায়। ছুটতে ছুটতে নাথুনি বলে; 'ওহী পঞ্ছী হামনিকো।'

লাখপতিয়া বলে, 'নহী, ওহী পঞ্ছী হামনিকো। হামনিকো ইটাসে জখম হুয়া—'

'নহী, হামনিকো—'

দু'জনে কাশের জঙ্গলে এসে পড়ে। তাদের পেছনে পেছন ধানোয়ার এবং অন্য হাভাতেরাও চলে এসেছে। সামনের দিকে খানিকটা তফাতে রক্তাক্ত সিল্লীটা ডানা ঝটপট করছে। ঘাড়টা তার ভেঙেই গেছে, ওটার আয়ু আর বেশিক্ষণ নেই।

লাখপতিয়া এবার কোনদিকে না তাকিয়ে জখমী পাখিটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তার আগেই প্রবল শক্তিতে তার কাপড় টেনে ধরে নাথুনি।

লাখপতিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখের কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে অশ্লীল খিস্তি দেয়, 'ছোড় দে হামনিকো, রাণ্ডী কাঁহিকা। ছোড় হামনিকো কাপড়া - '

নাথুনি শাড়িটা ছাড়ে না। দাঁত খিঁচিয়ে উত্তেজিত হিংস্র ভঙ্গিতে সে গলার শির ফুলিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'নহী ছোড়েগী। তু রাণ্ডী, তুহারকা মাঈ রাণ্ডী, তুহারকা নানী রাণ্ডী—' বলতে বলতে আচমকা শাড়িটা ছেড়ে দিয়ে সে সিল্লীটার দিকে ছোটে।

হঠাৎ কাপড়টা ছেড়ে দেওয়ায় টাল খেয়ে গিয়েছিল লাখপতিয়া। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে সে বনভৈস.র মতো নাথুনির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার চুলের গোছা ধরে টানতে থাকে। ততক্ষণে নাথুনিও লাখপতিয়ার চুল ধরে টানতে শুরু করেছে। চুল টানাটানির সঙ্গে সঙ্গে চলছে অশ্রাব্য খিস্তির আদান প্রদান। দেখতে দেখতে শীতের মজা বিলের মাটি পৃথিবীর আদিম রণভূমি হয়ে ওঠে।

আঁচড়ে কামড়ে দু'জনের হাত-পা এবং মুখ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। পরনের ময়লা চিটচিটে কাপড় ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যায়।

ধানোয়ার এবং অন্য হাভাতেরা কী করবে, ভেবে উঠতে পারছে না। হঠাৎ ধানোয়ার চেঁচিয়ে ওঠে, 'রুখ যাও, রুখ যাও।'

দুই আওরত তার কথা গ্রাহ্যই করে না; তুমুল লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে।

ধানোয়ার আবার চিৎকার করে, 'কা হোতি হ্যায়—এ জেনানারা রুখো রুখো—'

দুনিয়ার কোন দিকেই লাখপতিয়া বা নাথুনির নজর নেই এখন। যে ভাবেই হোক, পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্যই তারা ক্ষেপে উঠেছে।

ধানোয়ার আর কিছু বলে না। লাফ দিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'জনকে তফাতে সরিয়ে দেয়।

ছাড়িয়ে দেবার ফলে দু'জনে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রবল আক্রোশে এবং উত্তেজনায় লাখপতিয়া এবং নাথুনি সাপের মতো ফুঁসতে থাকে। বুক তোলপাড় করে জোরে জোরে গরম নিঃশ্বাস পড়ে।

দাঁতে দাঁত ঘষে নাথুনি চেঁচায়, 'ছোড় দো হামনিকো। ওহী রাণ্ডীর মুহমে আগ লাগিয়ে দিই।'

গলার স্বর কাঁপিয়ে হাত পা নেড়ে নেড়ে ভেংচে ওঠে লাখপতিয়া, 'হোয় হোয় হোয়, মুহ্‌মে আগ-লাগানেবালী। আরে কুত্তী, আরে গিধকা বচ্চী--আ আ আ-- তুহারকা কেত্তে তাকত হুয়া. হামনি দেখেগী।' বলে ধানোয়ারের দিকে তাকায়, 'এ পুরুখ, ছোড় দো ওহী রাণ্ডীকে বাচ্চী রাণ্ডীকো—'

ধানোয়ার এবার প্রচণ্ড জোরে ধমক লাগায়, 'চোপ হো যাও, বিলকুল চোপ—'

লাখপাতিয়া বলে, 'ঠিক হ্যায়, এই আমি মুখ বুজলাম। লেকেন তার আগে তোমার মুখ থেকে একটা সচ বাত শুনতে চাই। ভগোয়ানের নামে কসম খেয়ে বলতে হবে।'

'কা বাত?'

রক্তাক্ত সিল্লীটা এতক্ষণে মরে গেছে। কাশবনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে লাখপতিয়া বলে, 'সচমুচ বাতাও, ঐ পাখিটা কার—আমার, না ঐ ভুচ্চরকে বাচ্চীর?'

দশ হাত দূর থেকে নাথুনি সমস্ত শরীর নাচিয়ে ঝাঁকিয়ে চিল্লায়, 'হাঁ হাঁ, বাতাও'

ধানোয়ার একবার নাথুনিকে দেখে। পরক্ষণে লাখপতিয়ার দিকে তাকায়। বলে, 'আমি দেখছি, তোমরা দু'জনে দোগো পাথর ছুঁড়লে। তোমার পাথর পাখির গায়ে লাগেনি।'

লাখপতিয়া তীক্ষ্ণ খনখনে গলায় বলে, 'তা হলে কার পাথর লেগেছে?'

নাথুনিকে দেখিয়ে ধানোয়ার বলে, 'ওহী আওরতকা। তোমরা বিচার চেয়েছিলে। আমার মুহ্‌ থেকে সচ বাত শুনতে চেয়েছিলে। সচই বাতলাম। হামনিকো মুহ্‌সে ঝুট নহী নিকলেগা—হাঁ। হামনিকো মরদকা জবান'

ধানোয়ার যে হঠাৎ সত্য এবং ন্যায়ের জন্য এমন ক্ষেপে উঠবে, এতটা ভেবে উঠতে পারেনি লাখপতিয়া। সব শুনেও নিজের কানকে

সে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। যে আদমীটার পাশাপাশি হেঁটে একই দিনে সে আর তার সাস দক্ষিণের এই ধানক্ষেতগুলোতে এসেছে, সর্বক্ষণ যার গায়ের সঙ্গে প্রায় লেগেই থাকে, জঙ্গলে বা ক্ষেতিমালিকদের কোঠিতে সে যার সঙ্গে হানা দেয়, লুকিয়ে বাগনর আনার ব্যাপারে যার সঙ্গে গোপন চুক্তি করে, এমন কি রাত্রিতে 'ঘুরে'র আগুন জ্বালিয়ে কাছাকাছি ঘুমোয় পর্যন্ত, তার ওপর একটা অধিকার যেন জন্মে গিয়েছিল লাখপতিয়ার। তার বিশ্বাস ছিল, তার ক্ষতি হয় বা তার বিরুদ্ধে যায়, ধানোয়ার এমন কিছুই বলবে না বা করবে না। সূক্ষ্ম বা সুগোপন অধিকার বোধ থেকে সে ভেবে নিয়েছিল এই 'পুরুখ'টাকে সে ইচ্ছামতো আঙুলের ডগায় নাচাতে পারবে। সে যেভাবে চাইবে অবিকল সেইভাবে ধানোয়ার চলবে ফিরবে, উঠবে বসবে। এই ভরসাতেই সে ধানোয়ারকে সালিশীর দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু লাখপতিয়ার মতো অটুট দেহের সন্তানহীন একঘরিয়া আওরতের কাছাকাছি এতগুলো দিন থেকেও সে যে এত বড় সত্যভাষী হয়ে উঠবে, এটা যেন চিন্তাই করা যায় না। মনে মনে হাজার বার অকথ্য খিস্তি দেয় লাখপতিয়া। হারামজাদ, ভুচ্চর, হিজড়াকি ছৌয়া!

প্রথমটা দমে যায় লাখপতিয়া। তারপর রাগে এবং আক্রোশে তার চোখ দপদপ করতে থাকে। ধানোয়ারের কথা মানলে সিল্লীটা সে পাবে না। তার ওপর দেখা গেল, 'পুরুখ'টাকে সে দখল করে নিতে পেরেছে বলে যা ভেবেছিল, সেটাও ঠিক না। প্রবল উত্তেজনায় এবং হতাশায় চোখদুটো হঠাৎ দপদপিয়ে ওঠে লাখপতিয়ার। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। নাকের পাটা থিরথির কাঁপতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, 'তুমনি সবমুচ দেখা, ও রাণ্ডীকা ছৌরী পথরসে পঞ্ছী মারা?'

মাথা কাত করে ধানোয়ার বলে, 'সচমুচ দেখা। ভগোয়ান রামজী আউর কিষুণজী কসম—'

'ছোড় তুহারকা রামজী কিষুণজী। কুত্তা তুচ্চর কঁহাকা!'

সোমবারী রাতুয়া মঙ্গেরিরা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তারাও একসঙ্গে জানায়, নাথুনির পাথরের ঘা খেয়েই সিল্লীটা জখম হয়েছে। লাখপতিয়ার পাথর পাখির গায়ে লাগে নি। কাজেই ওটা পাওয়ার একমাত্র হক নাথুনিরই।

লাখপতিয়ার মনে হয়, সবাই একজোট হয়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। যার জন্য এই গভীর চক্রান্ত সে হল ঐ ছমকী আওরতটা। এখানে নতুন এসে সে সবার মুণ্ডু বিলকুল ঘুরিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ঐ ধানোয়ারের। অচমকা সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে যায় লাখপতিয়ার মারাত্মক ক্ষেপে ওঠে সে। পরসাদীদের দিকে তেড়ে গিয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করতে থাকে,'অ-অ-অ, দেখা তুলোগ! দেখা তুলোগ! কুত্তী কৌয়ার পাল।'

পরসাদীরাও মুখ বুজে থাকে না। অশ্রাব্য খিস্তির লেনদেনে পৌষের বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

মুখের জোর যতই থাক, একার পক্ষে এতগুলো হাভাতে পুরুষ এবং আওরতের প্রতিটি খিস্তির জবাব দিতে দিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই দম ফুরিয়ে যায় লাখপতিয়ার। হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে পা ছড়িয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে মড়াকান্না জুড়ে দেয় সে।

অনেক রাত্তিরে যখন গোটা চরাচর জুড়ে নিষুতি নেমেছে, গাঢ় কুয়াশায় ঢেকে গেছে আদিগন্ত ধানক্ষেত, মাথার ওপর সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর গোপন গর্তে কামার পাখিদের ডাক পর্যন্ত থেমে গেছে, হাভাতের দলের একজনও যখন আর জেগে নেই, সেই সময় 'ঘুরে'-র আগুনের পাশে শুয়ে শুয়েই মাথার ওপর থেকে ধুসো কম্বলটা সরিয়ে মুখ বড়োয় ধানোয়ার। এমনিতে তার বেজায় ঘুম। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনভৈসের মতো নাক ডাকতে থাকে। কিন্তু আজ সন্ধেবেলা খাওয়া দাওয়ার পর আর সবার মতো সেও মুড়ি দিয়ে

শুয়ে পড়ছিল কিন্তু ঘুমটাকে কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। প্রাণপণে চোখের পাতা টান করে রেখেছে। কখন নিষুতি নামবে, কখন গোটা দুনিয়া গাঢ় ঘুমে ডুবে যাবে, সে জন্য অনেক কষ্ট করে তাকে জেগে থাকতে হয়েছে।

দু হাত তফাতে কাঁথাটাথা মুড়ি দিয়ে বুড়ী শাশুড়ীকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে লাখপতিয়া। চাপা নীচু গলায় ধানোয়ার ডাকে, 'এ আওরত, এ আওরত—'

লাখপতিয়ার সাড়া মেলে না।

আরো বারকয়েক ডাকাডাকির পর হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে যায়। এক টানে মাথার ওপর থেকে ধুসো কম্বল সরিয়ে মুখ বার করে লাখপতিয়া, 'কা, কা হুয়া? এত রাতে শোর মচিয়ে নিদটা ভেঙে দিলে কেন? কা, কা ধান্দা তুমনিকো?'

লাখপতিয়ার চোখমুখ দেখে টের পাওয়া যায়, সেও এতক্ষণ ঘুমোয় নি। হয়ত সে জানত, মাঝরাতে গোটা পৃথিবী জুড়ে নিষুতি নামলে ধানোয়ার তাকে নিশ্চয়ই ডাকবে। তবু ঘুম ভাঙাবার কথা বলে সে যে গুসসা দেখাল, সেটা তার অহঙ্কার। অর্থাৎ ধানোয়ারের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ তার আদৌ নেই। সে তো ঘুমিয়েই ছিল। ধানোয়ারই নিজের গরজে তাকে ডেকে তুলেছে।

ধানোয়ার বলে, 'শোর মচালাম কোথায়? তুমিই তো আমার থেকে বেশি গলা চড়াচ্ছ!'

বিরক্ত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে লাখপতিয়া। তারপর বলে, 'মাঝরাতে নিদের সময় তোমার সাথ বাত-উত করার ইচ্ছা আমার নেই। এখন আমি ঘুমবো।' বলেই কম্বলটা আবার মুখের ওপর টানতে থাকে।

কিন্তু তার আগেই হাত বাড়িয়ে কম্বলটা ধরে ফেলে ধানোয়ার। বলে, 'নহী, নহী, নহী—'

'ছোড় দো—'

'নহী।'

'ছোড় দো--'

'নহী।'

কালচে ভারী ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে ধানোয়ারকে লক্ষ্য করতে করতে ধারাল গলায় লাখপতিয়া বলে, 'তুফারে হারামজাদকা বেটিয়া ঐ আওরতটাকে সিল্লীটা দিয়ে দিলে। এখন কম্বল টানাটানি করে দিল্লাগী হচ্ছে! কুত্তা ভূচ্চরকে ছৌয়া কঁহাকা। ছোড়, ছোড় মোরে কম্বলিয়া—'

ধানোয়ারের ওপর কোত্থেকে যেন অলৌকিক সাহস ভর করে। সে কম্বল ছাড়ে না। বলে, 'সিল্লীর কথাটা বলতে চাইছি। গুসসা না করে শোন না—'

'শুনা হ্যায় তুহারকা বাত। নয়া কা বাতাওগে!' লাখপতিয়া হঠাৎ ভয়ানক ক্ষেপে যায়। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সে যা বলতে থাকে তা এই রকম। নতুন আর কিছু বলার নেই ধানোয়ারের। দুপুরে যা বলেছিল সেগুলোই আরেক দফা মুখ দিয়ে হড় হড় করে বার করবে। অর্থাৎ তাকে সালিশ মেনে বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রামচন্দজী কিষুণজীর নামে কসম খেয়ে সে ঝুট বলে কী করে।

মুখটা বাঁকিয়ে চুরিয়ে দুপুরের মতোই ভেংচে ওঠে লাখপতিয়া, 'আরে বিচার করনেবালা! আরে কসমখানেবালা! হো হো, রামরাজকা মালিক আ গিয়া রে তু! কোনদিন যেন ওর মুহ্ থেকে ঝুটি জবান বেরোয় নি!' বলে এক হাতে ফের কম্বলটা টানতে থাকে। আরেক হাতের আঙুল দিয়ে 'ঘুরে'র ওধারে নাথুনির বিছানা দেখাতে দেখাতে গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে দেয়, 'যা যা, ঐ ছমকী রাণ্ডীর কম্বলের তলায় ঢুকে তার গায়ের গন্ধ শোঁক গিয়ে।'

ধানোয়ার নীচু গলায় করুণ মুখে বলে, 'এ সাসকা পুতহু, দিমাগ ঠাণ্ডা করে আমার কথাটা শোনই না—'

একটু থমকে যায় লাখপতিয়া। গলার স্বর নামিয়ে শুধোয়, 'কা বাত তুমনিকা?'

'এখন থেকে আর ভুল হবে না। যে-ই পঙ্খী মারুক, মছলি ধরুক, লালসা পিঁপড়ের ডিম পাড়ুক —বিচারের জন্যে আমাকে ডাকলে সব তোমাকে দিয়ে দেব।'

লাখপতিয়া উত্তর দেয় না ; স্থির চোখে তাকিয়েই থাকে।

ধানোয়ার বলে, 'কা, সমঝি ?'

'সমঝি—' ঠোঁট কামড়ে চোখের তারা ঘোরাতে ঘোরাতে গাঢ় গলায় লাখপতিয়া বলে, 'উল্লু কহাঁকা —'

শেষ কথাগুলো যে গালাগাল বা খিস্তি নয়, অন্য কিছুর প্রকাশ, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না ধানোয়ারের : হট্টকট্টা চেহারার একটা 'পুরুখ'কে পুরোপুরি নিজের দখলে নিয়ে আসার পর আস্তে আস্তে মুখের ওপর কম্বলটা টেনে দেয় লাখপতিয়া।

খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে ধানোয়ার। আবছা ভাবে কিছু একটা আন্দাজ করে সামান্য হাসে। তারপর সেও কাঁথা-টাথা টেনে মুড়ি দেয়। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পুষ মাসের হিমবর্ষী দীর্ঘ রাত পার করে দিতে পারবে ধানোয়ার।

॥ তের ॥

আরো ক'টা দিন কেটে গেল।

এর মধ্যে ধানক্ষেতগুলো আরো ফাঁকা হয়ে গেছে। তবে পাহারাদারি এবং ফসলকাটা সমানে চলছেই। দিন দশেক হল, পুষ বা পৌষ মাস পড়ে গেছে। একেকটা দিন যায়, শীত আরো জাঁকিয়ে পড়তে থাকে। আকাশ থেকে অনবরত গাঢ় তীব্র হিম নামে ; মাটির লক্ষ কোটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে দুনিয়ার সব শীতলতা উঠে আসে। মনে হয়, ধানক্ষেতের পাশে খোলা অকোশের নীচে এই অসহ্য শীতে একটা মানুষও বাঁচবে না। তবু যতক্ষণ মরে ফৌত না হয়ে যাচ্ছে,

পেটে তো কিছু দিতেই হবে। কাজেই খাদ্যের খোঁজে হাভাতেরা নিয়মিত দূরের জঙ্গলে আর বিলে হানা দিয়ে যাচ্ছে।

তবে দু'দিন ধরে ধানোয়ার জঙ্গলে যেতে পারছে না। তার ভীষণ বুখার। পরশুর আগের রাত থেকে তার জ্বর চলছে। দুটো দিন প্রায় বেহুঁশের মতো কেটেছে।

এত জ্বর দেখে লাখপতিয়া আর রামনৌসেরা মুনোয়ারপ্রসাদকে টেনে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কী সব লতাপাতা তুলিয়ে আনিয়েছিল। সেগুলো বেটে খাওয়াবার পর আজ সকাল থেকে জ্বরটা ছেড়ে গেছে ধানোয়ারের। তবে শরীরটা এখনও বেজায় কমজোরি মাথার ভেতরটা ভীষণ দুব্‌লা। উঠে দাঁড়াতে গেলে পা টলে যায়।

অন্যদিনের মতো আজও পুষ মাসের রোদ উঠতে না উঠতেই হাভাতের দলটা বিলে বা জঙ্গলে চলে গেছে। সপেরা জগলাল এবং তার জেনানা রামিয়া বেরিয়ে পড়েছে সাপের খোঁজে। মাদারী খেলোয়াড় হরমুখ দোসাদ তার দুই বাঁদর নিয়ে গেছে কাকাকাছি কোন একটা হাটে। ভিখ মাঙোয়ারাও ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশের গাঁগুলোতে।

কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলা এখন প্রায় ফাঁকা পড়ে আছে। ধানোয়ার ছাড়া আর যারা গাছতলায় রয়েছে তারা হল ক'টা বাচ্চাকাচ্চা আর বুড়োবুড়ী। যেমন লাখপতিয়ার বুড়ী সাস পরসাদীর ছেলে দুটো, সখিলালের ছোরাছোরীরা। অবশ্য ছমকী আওরত নাথুনি এবং তার ভোলাভালা মরদ গৈয়ারামও আছে।

জ্বর হবার আগে থেকেই ধানোয়ারের নজরে পড়েছে, নাথুনি এবং গৈয়ারাম আর জঙ্গলে যাচ্ছে না। কেন যাচ্ছে না তা আর জিজ্ঞেস করেনি। দরকারই বা কী? হয়ত ওদের কাছে যথেষ্ট খাদ্য আছে কিংবা ওরা ভুখাই থাকতে চায়। যার যেমন ইচ্ছা।

এই দিনের বেলায় নিভে যাওয়া 'ঘুরে'র পাশে শুয়ে শুয়ে ধান-

ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে ছিল ধানোয়ার। দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠে সেই একই নিয়মে ধানকাটা চলছে। চারিদিকে সেই মুসহর, মরশুমী আদিবাসী ধানকাটানি এবং পহেলবানরা ছাড়া আর কেউ নেই। অন্য দিনের মতোই ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশী শুগা আর চোটা ধানের শীষ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

পুষ মাসের সুরয ক্রমশ আকাশের খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। উত্তুরে হাওয়া উল্টোপাল্টা বয়ে যায়।

শীতের রোদ বড় নিস্তেজ, তবু তো রোদ। আস্তে আস্তে উঠে বসে হাত বার করে রোদে সেঁকতে থাকে ধানোয়ার। তার নির্জীব চোখের নজর থাকে ধানক্ষেতের দিকেই।

হঠাৎ ধানোয়ার দেখতে পায়, ফসলের জমি থেকে একটা পহেলবান কাচ্চীতে উঠে এসে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে নাথুনিদের কাছাকাছি গিয়ে বসে পড়ে। চোখ বুজে কিছুক্ষণ কী ভাবে সে। আবছাভাবে তার মনে হয়, কাল পরশু তরশু —এই তিন দিন সকালে জ্বরের ঘোরে যখন সে বেহুঁশ আর কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা আজকের মতোই ফাঁকা, সেই সময় এই পহেলবানটা নাথুনিদের কাছে ঘুরঘুর করছিল। আজকের মতো এরকম সরাসরি কাছে এসে বসে নি। ধানোয়ার সোজা তাকিয়ে কানখাড়া করে থাকে। পহেলবানটার মাথায় গামছা পেঁচিয়ে বাঁধা। সেটার ভাঁজ থেকে তামাকপাতা এবং চুন বার করে হাতের তেলোতে ডলে ডলে খৈনি বানাতে বানাতে সে বলে, 'ক' রোজ ধরেই ভাবছি, তোদের সাথ জান পয়চান করে যাই। লেকেন টেইন (টাইম) হচ্ছে না। আজ চলেই এলাম।'

নাথুনির মরদ গৈয়ারাম পহেলবানকে দেখে বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দমবন্ধ গলায় সে বলে, 'কুছ কসুর হুয়া হামনিকো পহেল-বানজী? আমরা কিন্তু ক্ষেতিতে নামি নি।'

গৈয়ারামকে ভরসা দিয়ে পহেলবান বলে, 'আরে নহী নহী।

আমি জানি তোরা আচ্ছা আদমী—থোড়া গপ-উপ (গল্প টল্প) করতে এলাম।' বলে বেশ জুত করে মাটিতে বসে পড়ে।

গৈয়ারাম ভয় পেলেও নাথুনি কিন্তু এতটুকু ঘাবড়ায় নি। বাজ-পাখির মতো ধারাল চোখে পহেলবানকে দেখতে দেখতে চাপা গলায় বলে, 'কা সৌভাগ হামনিলোগকা -- ' মনুষ্যজাতি, বিশেষ করে পুরুষ সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। তাদের মতো ভুখা আধনাঙ্গা মানুষের কাছে পহেলবানের এভাবে যেচে আসাটা ভেতরে ভেতরে তার সন্দেহকে উসকে দিয়েছে।

কালো কালো ট্যারাবাঁকা অনেকগুলো দাঁত বার করে খানিকটা মজা করার চেষ্টা করে পহেলবান। বলে, 'আ রে, সৌভাগ তো আমার - '

সতর্ক ভঙ্গিতে নাথুনি শুধোয়, 'আপনিকো সৌভাগ।'

'নহী তো কা? তোর মতো সুনহলা নাজুক আওরতের কাছে বসাটা সৌভাগ না?' বলে গোটা শরীর দুলিয়ে জোরে জোরে হেসে ওঠে পহেলবান।

নাথুনি উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

খৈনি বানানো হয়ে গিয়েছিল। নেশার জিনিসসুদ্ধ হাতের চেটোটা নাথুনির দিকে বাড়িয়ে পহেলবান বলে, 'লে—'

এত খাতিরদারির কারণটা এতক্ষণে পুরোপুরি ধরে ফেলেছে নাথুনি। ন্যায্য পাওনা বুঝে নেবার ভঙ্গিতে খানিকটা খৈনি তুলে নিয়ে দাঁত এবং ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দেয় নাথুনি।

এবার হাতটা গৈয়ারামের দিকে বাড়ায় পহেলবানটা। বলে, 'তু ভি লে—'

সাদাসিধে ভোলাভালা গৈয়ারাম অতি সন্তর্পণে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দুই আঙুল দিয়ে অল্প একটু খৈনি তুলে নেয়। বড় জমি-মালিকের পাহারাদারের হাত থেকে খৈনি নিতে পেরে তার চৌদ্দ পুরুষ যেন উদ্ধার হয়ে যায়। অন্তত তার মুখচোখ দেখে তাই মনে হয়।

এবার আলাপ জমানো শুরু করে পহেলবানটা, 'হামনিকো নাম হ্যায় মধেলি সিং—রাজপুত ছত্রিয়।' নিজের বংশ পরিচয় এভাবে দিতে শুরু করে সে। তার বাপ, নানা, নানার বাপ, নানার বাপের বাপ অর্থাৎ দশ পুরুষ ধরে তারা পহেলবানি বা পালোয়ানি করে আসছে। তাদের কাজ হল, পুরুষানুক্রমে বড়ে ক্ষেতিমালিক ত্রিলোকী সিংদের জমি পাহারা দেওয়া এবং সব দিক থেকে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা।

বংশ-পরিচয় দেবার পর মধেলি সিং শুধোয়, 'তোদের নাম কী?'

গৈয়ারাম এবং নাথুনি তাদের নাম জানিয়ে দেয়।

'কী জাত তোরা?'

'গাঙ্গাতো।'

'অছুতিয়া?'

গৈয়ারাম ঘাড় কাত করে তৎক্ষণাৎ।

মধেলি সিং দাঁতের নীচে আরেক দফা খৈনি গুঁজে বলে, 'জাতওয়ারি সাওয়াল নিয়ে আমি মাথা খারাপ করি না। আমার অত ছুয়াছুত নেই। সমঝা?'

রাজপুত ক্ষত্রিয়ের এতবড় মহানুভবতায় একেবারে গলে যায় গৈয়ারাম। সে যে কী বলবে, কী করবে, ভেবে উঠতে পারে না। তবে তার জেনানা নাথুনির মনের কথা আদৌ বোঝা যায় না। নাথুনির কাছে এটা কোন 'তাজ্জবকা বাতই' নয় যেন। বাজের মতো তীক্ষ্ণ চোখে মধেলি সিংকে দেখতে দেখতে পিচিক করে খয়েরি রঙের খৈনি মেশানো খানিকটা থুতু ফেলে।

মধেলি সিংয়ের ওপর আচমকা দুনিয়ার সব উদারতা যেন ভর করে। প্রচণ্ড উৎসাহে সে বলতে থাকে, 'আমার কাছে সব আদমী সমান। ভগোয়ান রামচন্দ্রজী আউর বিষুণজী কাউকে উঁচা জাত কাউকে নীচা জাত করে পাঠিয়েছে। লোকেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

এমন একটা মহত্ত্বের কথা শুনেও নাথুনি চমকায় না। তবে গৈয়ারাম একেবারে অভিভূত হয়ে যায়। সে বলে, 'পহেলবানজী, আপনার কথা বিলকুল সাধু মহাত্মাদের মতো। উঁচা জাতের আদমীরা আমাদের গায়ে থুক দেয়, আমাদের গায়ে গা লেগে গেলে নাহানা করে শুধ হয়। আপনার মতো আদমী আমরা আগে দেখে নি।'

মধেলি সিং কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল আচমকা তার চোখ পড়ে ধানোয়ার তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চোয়াল শক্ত করে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'শালে ভুচ্চর, কা দেখতা ইধরি?'

ধানোয়ার ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। ঢোক গিলে বলে, 'কুছ নায় পহেলবানজী—এমনিই তাকিয়ে আছি।'

'এমনিই তাকিয়ে আছি!' মধেলি সিং খৈনির ছোপ-ধরা কালো কালো দাঁত বার করে ভেংচে ওঠে, 'উধরি দেখ গিধকা ছৌয়া—'বলে উল্টোদিকে আঙুল বাড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসে ধানোয়ার। চোখ তার যেদিকেই থাক, কান দুটো নাথুনিদের দিকেই খাড়া হয়ে থাকে।

মধেলি সিং গোলাকার সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ ধানোয়ারকে লক্ষ্য করে। তারপর গৈয়ারামদের কাছে আরেকটু ঘন হয়ে বসে মোলায়েম গলায় শুরু করে, 'এ নাথুনি—'

নাথুনি বলে, 'কা?'

'টুটাফাটা কাপড়া পরে আসিছ কেন? বদবু বেরুচ্ছে। তোর যা চেহারা তাতে জগমগ জগমগ শাড়ি পরলে বিলকুল পরী বনে যাবি—হাঁ' বলে চোখ কুঁচকে নিঃশব্দে হাসে মধেলি সিং।

নাথুনি উত্তর দেয় না।

মধেলি সিং বিপুল উৎসাহে এবার বলতে থাকে, 'কা রে, চুপ করে থাকলি কেন? হমনি যো বোলা—সচ নায় ঝুট—বাতা, বাতা জলদি বাতা—'

'কা বাতাউগী?'

'তোর দিল যা চায়—'

মধেলি সিংয়ের চোখে চোখ রেখে নাথুনি চাপা গলায় বলে, 'আমরা ভুখা ভিখমাঙোয়া। কঁহা মিলি জগমগ জগমগ কপড়া ?'

'বহোত দুখকা বাত' জিভের ডগায় চুকচুক করে আক্ষেপসূচক একটু আওয়াজ করে মধেলি সিং। তারপর এক নাগাড়ে যা বলে যায় তা এই রকম। রামচন্দ্রজী বিষুণজী কেন যে দুনিয়ার কোন কোন আদমীকে পয়সাওলা আর কোন কোন আদমীকে নাঙ্গা এবং ভুখা করে পাঠায় কে জানে। সবই ভগোয়ানকা মর্জি।

নাথুনি চুপ করে থাকে।

বিষুণজী এবং রামচন্দ্রজীর প্রসঙ্গ পাল্টে হঠাৎ যেন ক্ষেপেই ওঠে মধেলি সিং, 'লেকেন তোর যা চেহারা, যা উমর তাতে জগমজ জগ-মগ কপড়া তোর পরতেই হবে—হাঁ।'

নাথুনি বলে, 'পেটের দানা জোটে না তো জগমগ কপড়া!'

মধেলি সিং কী বলতে যাচ্ছিল, আচমকা পাক্কীর দিক থেকে একটা হৈ চৈ শোনা যায়। সেই সঙ্গে হাওয়া গাড়ির আওয়াজ। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে সে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ে। বড় ক্ষেতি-মালিক ত্রিলোকী সিং তাঁর বিশাল মোটরে প্রকাণ্ড শরীর এলিয়ে জমিতে আসছেন। এক মুহূর্তও আর দাঁড়ায় না মধেলি; ঊর্ধ্বশ্বাসে পাক্কীর দিকে ছুটতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত মধেলি সিং নাথুনিকে আর কী কী বলত, অজনাই থেকে যায়। সে জন্য একটু দুঃখ হয় ধানোয়ারের। তবে আবছা-ভাবে সে টের পায়, এখানেই ব্যাপারটা চুকেবুকে গেল না। পহেলবান মধেলি সিং গাঙ্গাতোদের দুযকী আওরত নাথুনির কাছে আবার আসবে। জরুর আসবে।

সেদিনই রাত্তিরে পুষ মাসের তীব্র হিমে সমস্ত চরাচর যখন অসাড় তখন 'ঘুরে'র চারপাশে একজনও জেগে নেই। আজ এমন

বেজায় শীত যে সিমার এবং কড়াইয়া গাছগুলোর গর্তে নিশাচর কামাব পাখিগুলো পর্যন্ত চুপ করে গেছে।

অন্য দিনের মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল ধানোয়ার। আচমকা একটা চাপা গলার শব্দে তার ঘুম ছুটে যায়। কে যেন কাছাকাছি কোথায় একটানা ডেকে চলেছে, 'এ আওরত, এ গাঙ্গাতিন আওরত—'

প্রথমটা ধানোয়ার ভেবেছিল যার যাকে খুশি ডেকে যাক, সে ঘুমিয়েই থাকবে। কিন্তু হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে একটানে মাথার ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে এধারে ওধারে তাকাতেই সব চোখে পড়ে যায়।

জ্বলন্ত আসান কাঠের 'ঘুর' পুষের হিমে নিভে এসেছে। আগুনের জেল্লা না থাকলেও বোঝা যায়, 'ঘুরে'র ওধারে পহেলবান মধেলি সিং একটা বিছানার ওপর ঝুঁকে অনবরত ডাকাডাকি করে চলেছে। ধানোয়ার ভাল করেই জানে ওখানে কে শুয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর কাঁথাকানি সরিয়ে মুখ বার করে নাথুনি। ঘুমের ঘোরে জড়ানো গলায় বলে, 'কৌন ?'

ইশারায় তাকে চুপ করিয়ে নীচু গলায় ফিসফিসিয়ে কী বলে যায় পহেলবান মধেলি সিং, ধানোয়ার বুঝতে পারে না। তবে নাথুনি আর শুয়ে থাকে না ; হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে এবং ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশের ঘুমন্ত মানুষগুলোকে দেখে। নাথুনি নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, কেউ কোথাও জেগে নেই। সে বুঝতে পারে না, নিভন্ত 'ঘুরে'র ওধারে কুয়াশা এবং অন্ধকারে একটা মানুষ তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

নাথুনি এবার দ্রুত উঠে দাঁড়ায় ; তারপর গায়ে কাঁথা জড়িয়ে মধেলি সিংয়ের সঙ্গে কাচ্চী পেরিয়ে ধানক্ষেতে নেমে যায়। গাঢ় হিমে তাদের আর দেখা যায় না।

দেখতে দেখতে এই হিমবর্ষী শীতের রাতেও ধানোয়ারের কপালে

ঘাম জমে ওঠে। খাদ্য ছাড়া চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে এতকাল আর কোনদিকে তাকাবার সময় পায় নি সে। জগৎ এবং মানুষ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা খুবই কম। হঠাৎ তার মনে হয় যে মরদের পাশ থেকে মধ্যরাতে নাথুনি উঠে অন্য 'পুরুখে'র সঙ্গে চলে যায় সেই গৈয়ারাম কি এতই ভোলাভালা, এতই সোজা মানুষ? তার ঘুম কি এতই গভীর যে আওরতের এই চলে যাওয়া সে টের পায় নি? হো রামজী, তেরে মর্জি।

বিষণ্ণ দুঃখিত ধানোয়ার ধীরে ধীরে কম্বলটা আবার মাথার ওপর টেনে দেয়।

পরের দিন ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়ে ধানোয়ারের। চোখ মেলে সে দেখে রোদ উঠে গেছে। মুসহর আর আদিবাসী ধান কাটা-নিরা সামনের ক্ষেতিগুলোতে ধান কেটে চলেছে।

এদিকে কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা এখন প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। ধানোয়ার ঘুম থেকে উঠবার আগে রামনৌসেরারা নিশ্চয়ই খাদ্যের খোঁজে জঙ্গলে বা বিলে চলে গেছে। লাখপতিয়ার বুড়ী শাশুড়ী, পঙ্গু ছনেরি এবং দু-চারটে বাচ্চাকাচ্চা ছাড়া আর যে দু'জন আছে তারা হল গৈয়ারাম আর নাথুনি। আগের তিন চার দিনের মতো ওরা আজও জঙ্গলে যায় নি।

আজ জ্বর নেই ধানোয়ারের। তবে শরীর বেজায় কাহিল লাগছে। কিছুক্ষণ দুর্বল চোখে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর পাক্কীতে বাস লৌরি বা গৈয়াগাড়ির চলাচল দেখে। একসময় নিজের অজান্তেই কখন যেন তার চোখ কড়াইয়া এবং সিমার গাছ-গুলোর তলায় নাথুনিদের দিকে ফিরে আসে। আগে লক্ষ্য করে নি, এবার দেখা যায়, ওরা ছেঁড়া চটের ভেতর কাঁথা কম্বল, ভাঙাচোরা বর্তন অর্থাৎ তাদের যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি পুরে বাঁধাছাঁদা করছে।

আচমকা কাল রাত্তিরের সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়

ধানোয়ারের। মধ্যরাতে মখেলি সিংয়ের সঙ্গে নাথুনি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ জেগে ছিল সে। তারপর কখন আওরতটা ফিরে এসেছে, টের পায় নি। ভোলাভালা গৈয়ারামও টের পেয়েছে কিনা, কে জানে। অন্তত তার মুখচোখ দেখে তা বুঝবার উপায় নেই।

পলকহীন তাকিয়েই থাকে ধানোয়ার। কিছুক্ষণ পর নাথুনিরা পোঁটলা-টোটলা ঘাড়ে এবং মাথায় তুলে পাক্কীর দিকে হাঁটতে শুরু করে। ধানোয়ার রীতিমত তাজ্জব বনে যায়। শুধোয়, 'কা, তোমরা চলে যাচ্ছ যে?'

গৈয়ারাম এবং নাথুনি দাঁড়িয়ে যায়। গৈয়ারাম বলে, 'হাঁ ভেইয়া যাতা হ্যায়।'

'এখনও তো ক্ষেতির পুরা ফসল ওঠেনি। তোমরা ধান কুড়োবে না?'

গৈয়ারাম কী জবাব দেবে, বুঝতে না পেরে তার জেনানার দিকে তাকায়। নাথুনি বলে, 'কী করব, পরে ভেবে দেখব।' গৈয়ারামকে বলে, 'সূরয চড়ে যাচ্ছে। আও আও —' বলে পা বাড়িয়ে দেয়। গৈয়ারাম আর দাঁড়ায় না, নাথুনির পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করে।

অন্য সব হাভাতের মতোই ফাঁকা শস্যক্ষেত্র থেকে ধান কুড়োতে এসেছিল নাথুনিরা। হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে না কুড়িয়েই তারা চলে যাচ্ছে! ভেবে ভেবে থই পায় না ধানোয়ার। বিড়বিড় করে আপন মনে বলে, 'হো রামজী, তেরে কিরপা।'

॥ চোদ্দ ॥

বুখারের দরুন শরীর কমজোরি হয়েছে বলে কিছুদিন যে জিরিয়ে নেবে, এমন শৌখিন মানুষ ধানোয়ার নয়। খাদ্যের সন্ধানে আর সব হাভাতের সঙ্গে আবার তাকে জঙ্গলে বা বিলে যেত হয়।

জঙ্গলের কুল, লাল পিঁপড়ের ডিম, মধু, বাগনর বা অন্য সব

ফলমূল এমন অফুরন্ত নয় যে দিনের পর দিন এতগুলো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে। সেখানকার খাদ্য প্রায় ফুরিয়ে আসে। এদিকে ডান দিকের বিলের মাছ, কচ্ছপ, গুগলিও শেষ হয়ে এসেছে। আজকাল ফাঁদ ঢিল বা ইটের টুকরোর ভয়ে সিল্লী, লাল হাঁস, কাঁক বা মানিক পাখিও বেশি আসে না। অথচ ক্ষেতে এখনও ধান রয়েছে; সব শস্য মালিকের খালিহানে না ওঠা পর্যন্ত সেখানে নামাও যাচ্ছে না। কাজেই হাভাতেরা খুবই ভাবনায় পড়ে যায়।

একদিন সকালে সখিলাল বলে, 'জঙ্গলের সব কিছুই তো আমরা খতম করে এনেছি। অব কা করে চাচা?'

চাচা অর্থাৎ রামনৌসেরা। ক'দিন ধরে এ সম্পর্কে সে-ও যথেষ্ট ভাবছে। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সে বলে, 'শুনেছি ঐধারে একটা বড় বিল আছে। ওখানে বহোত মছলি মেলে। তা ছাড়া এহী সাল অনেক মানিক পাখি এসে পড়েছে।' বলে পাক্কীর ওধারে বরাবর দক্ষিণ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

ফিতুরাম বলে, 'ওখানে একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।'

রামনৌসেরা গলায় জোর ঢেলে বলে, 'হাঁ, জরুর।'

ঠিক হয়, দুপুরের দিকে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ধানোয়ার এবং লছমন নতুন বিলের সন্ধানে বেরুবে।

সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এলে ধানোয়ার এবং লছমন নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

লাখপতিয়া তাদের সঙ্গে যেত চেয়েছিল কিন্তু তার সাস মড়াকান্না জুড়ে দিয়ে তাকে যেতে দেয় নি। এ তো আর খাদ্যটাদ্য নয় যে যেতেই হবে। বিলের খোঁজ আনতে ধানোয়াররাই যাক। তাদের সঙ্গে একটা আওরত না গেলেও চলবে। আসলে সেই ভয়টা বুড়ীর ভেতর সর্বক্ষণ অনড় হয়ে আছে। তার যুবতী পুতহু এই বুঝি ধানোয়ারের সঙ্গে পালিয়ে যায়।

কান্নাকাটি করে শেষ পর্যন্ত বুড়ী লাখপতিয়ার যাওয়া আটকে দেয়

লছমনকে নিয়ে ধানোয়ার প্রথমে পাক্কীতে এসে ওঠে। দক্ষিণ দিকে বরাবর খানিকক্ষণ হাঁটার পর রাস্তার লোকজনের কাছে বিলের হদিস জেনে নিয়ে ওধারের কাচ্চীতে নেমে পড়ে। এবার তাদের কোণাকুণি আরো অনেকটা যেতে হবে।

পাকা সড়কের ওপাশের মতোই এধারেও আদিগন্ত ফসলের ক্ষেত। এখানেও ধানকাটা চলছে এবং মালিকের পাহারাদাররা তদারক করছে। এখানেও মাথার ওপর শীতের মেঘশূন্য নীলাকাশ, সাদা সাদা মেঘ, অফুরন্ত উত্তুরে হাওয়া, পরদেশী শুগা আর চোটার ঝাঁক।

সূরয পছিমা আকাশের দিকে যখন বেশ খানিকটা নেমে গেছে সেই সময় ধানোয়াররা দক্ষিণের বিলে পৌঁছে যায়। কিন্তু এতটা রাস্তা এবং এত মাঠ পাড়ি দেওয়া কোন কাজেই লাগে না।

দক্ষিণের এই বিলটা বেশ বড়সড়ই। ধানোয়ারদের কাচ্চীর পেছন দিকের বিলটার মতোই এখানে বেশির ভাগ জায়গাতেই জল শুকিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। যেখানে যেখানে অল্পস্বল্প জল আছে সেখানে চাপ-বাঁধা অজস্র কচুরিপানা। শুকনো ডাঙাগুলোতে কাশের জঙ্গল, উদ্দাম বুনো ঘাসের বন। এখানেও কাঁক, সিল্লী, মানিক পাখি, লাল হাঁস অর্থাৎ শীতের মরসুমী পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়েছে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে প্রচুর লোকজন। কম করে তিরিশ চল্লিশ জন তো হবেই। এক নজরেই টের পাওয়া যায়, ওরা ধানোয়ারদের মতোই ভুখা, হাভাতে, আধনাঙ্গা।

লছমন বলে, 'কুছ কায়দা নহী ধানবারচাচা। ইধরি ভি বহোত আদমী।' সে বোঝাতে চায়, যেখানে এত লোক আগেই এসে জড়ো হয়েছে সেখানে বিশেষ সুবিধা হবে না।

ধানোয়ারেরও তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু এতটা এসে চুপচাপ ফিরে যেতে তার মন সায় দেয় না। দুনিয়ার কোথাও এক ছিটে খাদ্য অরক্ষিত পড়ে থাকার উপায় নেই, হাভাতের দল অনবরত তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে এমন খুব কম জায়গাই

ধানোয়ার আবিষ্কার করতে পেরেছে যেখানে বেওয়ারিশ খাদ্য আছে অথচ মানুষ সেখানে পৌঁছয় নি। সে বলে, 'দেখা যাক। আয়—'

দু'জনে বিলের ভেতর সেই লোকগুলোর কাছে চলে আসে। তাদের দু-চারজনকে চেনা মনে হয় ধানোয়ারের। ওরাও ধারাল সন্দিগ্ধ চোখে ধানোয়ারদের দেখতে থাকে।

একটা আধবুড়ো লোক লছমনকে বলে, 'কা রে লছমনিয়া, পাক্কীকা উধারসে ইধরি আয়া! কা হ্যায় তুলোগনকা মনমে? কা ধান্দা?'

এবার মনে পড়ে যায় ধানোয়ারের, যে দলটার সঙ্গে লছমন এবং ছনেরি পাক্কীর ওধারে তাদের সেই সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় গিয়েছিল সে দলে এই আধবুড়ো লোকটাও ছিল। লছমনের বয়স কম, কী বলতে কী বলে বসবে, তাই ধানোয়ারই ব্যস্তভাবে জবাবটা দেয়, 'কুছ নহী মনমে। ইধরি উধরি ঘুমতা ফিরতা থা। ঘুমতে ঘুমতে চলা আয়া।'

লোকটা বলে, 'ঝুট।'

ধানোয়ার বলে, 'সচ। রামজী কসম।' একান্ত অবলীলায় সে মিথ্যে বলে যায়।

লোকটা সোজা ধানোয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'সমঝ গিয়া তুলোগনকা ধান্দা।' তারপর একনাগাড়ে বলে যায়, তারা যখন পাকা সড়কের ওধারে গিয়েছিল ধানোয়াররা ভাগিয়ে দিয়েছে। কাজেই তারাও ওদের এখানে ঘেঁষতে দেবে না। লোকটা চড়া মেজাজে এবার জানায়, এখানে সুবিস্তা হবে না। ভূচ্চরের দল যেন এখনই ভেগে যায়।

অন্য লোকজনও তার সঙ্গে গলা মেলায়, 'ভাগ যা।'

'যাতা হ্যায়—'

আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। তাদের মতলব শুরুতেই ধরে ফেলেছে এই লোকগুলো। ফলে এত বড় একটা অভিযান পুরোপুরি

ব্যর্থ হয়ে যায়। ধানোয়ার এবং লছমন বিল থেকে কাচ্চীতে উঠে পাকা সড়কের দিকে হাঁটতে থাকে।

ওভাবে ভাগিয়ে দেবার জন্য ভেতরে ভেতরে ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছিল লছমন। সে গজগজ করতে থাকে, 'শালে গিদ্ধড়েরা—'

ধানোয়ার কিন্তু তেমন উত্তেজিত হয় নি। অনেকটা নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সে জানায়, গুসসা করে লাভ নেই। তারাও ওদের কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন ওরা শোধ নিল। যে যা করবে, তার ফলটিও হাতে হাতে পাবে। দুনিয়ার এই হল কানুন।

এমন ঠাণ্ডা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ব্যাপারটা মেনে নিতে নারাজ লছমন। সে গালাগাল দিতেই থাকে।

ধানোয়ার আর কিছু বলে না।

পাক্কীতে যখন দু'জনে উঠে আসে, সূর্য পছিমা আকাশে আরো অনেকটা নেমে গেছে। রোদের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে অনবরত পৌষের হিম মিশতে শুরু করেছে।

পাক্কীতে রোজকার মতোই বাস, লৌরি, ভৈসা এবং বয়েল গাড়ি স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। সে সবের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ধানোয়ার আর লছমন দু'ধারে তাকায়। ধানক্ষেতের পরিচিত দৃশ্য ছাড়া কোথাও কিছু নেই।

পুষ অর্থাৎ পৌষ মাস পড়তেই বাতাস আরো হিমেল হয়ে উঠেছে। এই বিকেল বেলাতেই হিম পড়তে শুরু করেছে। আকাশ যেখানে দিগন্তে নেমেছে সেই জায়গাটা এখন ঝাপসা দেখায়।

খানিকটা হাঁটার পর রাস্তার তলায় শুকনো নয়ানজুলিতে সপেরা জগলালকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধানোয়ার। অগত্যা লছমনকেও থামতে হয়। জগলাল উবু হয়ে প্রায় মাটিতে ঝুঁকে একদৃষ্টে কি যেন দেখছে। তার জেনানা শক্ত চেহারার রামিয়া কাছাকাছি বসে

পেটফোলা তুমড়ি বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। সুরের উঁচুনীচু ঢেউ শীতের বাতাসে ভাসতে ভাসতে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছাকাছি পড়ে আছে অনেকগুলো সাপের ঝাঁপি আর কিছু পোঁটলাপুঁটলি। রামিয়া এবং জগলাল যেখানেই যাক, নিজেদের যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি নিয়েই যায়। ও সব কার জিম্মায় রেখে যাবে? বিশ্বাস করার মতো মানুষ এই দুনিয়ায় ক'টাই বা আছে?

লছমনও জগলালদের দেখতে পেয়েছিল। সে বলে ওঠে, 'সপেরা জগলাল ভেইয়া—'

ধানোয়ার মাথা নাড়ে, 'হাঁ—'

'সাঁপ পাকড়তা।'

'হোগা অয়সা। চল, দেখে আসি।'

'নহী ধানবারচাচা, আমি যাব না।'

'কেমন করে সপেরারা সাঁপ পাকড়ায়, দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'তবে তুমি যাও। হামনি লৌট যাতা—'

'ঠিক হ্যায়—'

লছমন আর দাঁড়ায় না; পাকা সড়ক ধরে বরাবর হাঁটতে থাকে। আর রাস্তা থেকে নীচে নেমে জগলালদের কাছে চলে আসে ধানোয়ার। আসলে তার হাতে এখন অঢেল সময়। কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় ফিরে গিয়েও কিছুই করার নেই। দ্রুত ফাঁকা হয়ে আসা ধানক্ষেতগুলোর দিকে হাত-পা গুটিয়ে দিনের পর দিন তাকিয়ে থাকতে কার আর ভাল লাগে। তার চাইতে জগলালের সাপধরা দেখে ওদের সঙ্গেই ফেরা যাবে। ভাতের খোঁজে এসে রোজ রোজ একঘেয়ে সময় কাটিয়ে চলেছে সে। আজ একটু অন্যরকমই হয়ে যাক। তাছাড়া এই অঘ্রান-পুষ মাসে তাবৎ সাপ যখন মাটির ওপর থেকে পৃথিবীর অতল স্তরে ঘুমোতে চলে যায় তখন জগলাল কী করে তাদের ধরে সেটা দেখারও কৌতূহল হচ্ছে।

ধানোয়ারের পায়ের শব্দে বাঁশি থেমে যায় রামিয়ার। একটু

চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় জগলাল। হেসে বলে, 'কা ধানবার ভেইয়া, ইধরি?'

কী উদ্দেশ্যে এদিকে এসেছিল সংক্ষেপে জানিয়ে ধানোয়ার বলে, 'সাঁপ পাকড়ো। হামনি দেখেগা।'

'বহোত আচ্ছা—' বলেই রামিয়ার দিকে তাকায় জগলাল, 'কা রে, তু রুথ গিয়া কায়? বাজা বাঁশুরি।'

ফের তুমড়ি বাঁশি বাজাতে শুরু করে রামিয়া আর জগলাল আবার মাটিতে ঝুঁকে পড়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে থাকে।

ধানোয়ার শুধোয়, 'এত জোরে সাঁস (শ্বাস) টানছ কেন?'

জগলাল বলে, 'গন্ধ শুঁকছি।'

'কীসের গন্ধ?'

'মিট্টিতে নাক রেখে সাঁস টানো, বুঝতে পারবে।'

কথামতো ধানোয়ার মাটির ওপর অনেকখানি ঝুঁকে শ্বাস টানে। তারপর বিমূঢ়ের মতো জগলালের দিকে তাকায়।

জগলাল জিজ্ঞেস করে, 'কুছ মালুম হুয়া?'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকায় ধানোয়ার। জানায়, পৌষ মাসের ঠাণ্ডা মাটির গন্ধ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারছে না।

অবাক হয়ে জগলাল বলে, 'কোই গন্ধ্ নহী মিলা? বঢ়িয়া সুগন্ধ্?'

'নহী তো!' ধানোয়ার আগের মতোই মাথা ঝাঁকায়।

এবার রীতিমত ক্ষেপেই যায় জগলাল। ধানোয়ারের ঘ্রাণশক্তি সম্বন্ধে তার প্রবল সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বলে, 'কা, তোমার নাক আছে তো?'

জগলালের উত্তেজনা দেখে মজা পায় ধানোয়ার। হাসতে হাসতে বলে, 'হ্যায় তো। এ দেখো—' আঙুল দিয়ে নিজের নাকটা দেখিয়ে দেয় সে।

জগলাল, বলে, 'ও জিন্দা আদমীকা নাক নহী, মুর্দাকা নাক—'

'মানতা হ্যায় হামনিকো নাক মুর্দাকা নাক। লেকেন—'

'কা ?'

'মিট্টি ছাড়া এখানে কীসের গন্ধ্ আছে ? বাতাও—বাতাও—'

অসহায়ের মতো ঘাড় নাড়ে ধানোয়ার, 'মালুম নহী—'

জগলাল বলে, 'সাঁপকা গন্ধ্। কোন সাপ, জানো ?'

'কোন ?'

'থুথুরবা (এই সাপকে দোমুহিয়াও বলে। এরা মানুষ বা জন্তু জানোয়ার দেখলে অনবরত থুতু ছিটকায়। এদের থুতুতে বিষ থাকে)।'

ধানোয়ার অবাক হয়ে যায়, 'হাঁ !'

'হাঁ। লেকেন সাঁপটা রয়েছে অনেক নীচে। আপসোসকা বাত, ওটাকে বার করে আনতে পারব কিনা, বুঝতে পারছি না।' জগলালকে বেশ চিন্তাগ্রস্ত দেখায়।

ধানোয়ারের বিস্ময় কাটে না। সে বলে, 'মাটির গন্ধ্ শুঁকেই বলে দিতে পার, কোথায় কোন সাপ আছে !'

'জরুর।' জগলাল জানায়, এটুকু যদি না-ই পারল তা হলে সারা জীওন সাপের পেছনে ছুটছে কেন ? বৃথাই তা হলে তার সপেরা হওয়া।

ধানোয়ার এবার কিছু বলে না।

জগলাল থামে নি। সে সমানে বকে যায়। সাপের চলার দাগ দেখে নাকি সে বলে দিতে পারে কোথা দিয়ে গেছে বিষাক্ত গেহুমন বা ধামন। বলতে পারে কোনটা সাঁকড় অথবা করায়েতের পেট টেনে চলার চিহ্ন। কোন সাপের গর্তের মুখে বসে সে টের পায় এখানে ছানাপোনা সুদ্ধ রয়েছে হরহরা কিংবা তেলিয়া। তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এতই প্রখর যে, জলে স্থলে বা মাটির অতলে কোন সাপের লুকিয়ে থাকার উপায় নেই। জগলাল তাদের খুঁজে বার করবেই। কোন্ সাপের গায়ে কী গন্ধ, ঋতুতে ঋতুতে সেই গন্ধ কীভাবে বদলায়, সব

তার জানা। কোন সাপের রঙ কী, তাদের বিয়ের ক্রিয়া কেমন, অর্থাৎ তুনিয়ার তাবৎ সাপের কুলশীল, সমস্ত কিছুই তার মুখস্থ।

শুনতে শুনতে মুনোয়ারপ্রসাদের কথা মনে পড়ে যায় ধানোয়ারের। মুনোয়ারপ্রসাদ যেমন ধান চেনে, অবিকল তেমনি জগলাল সপেরা চেনে সাপ। তারিফ করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে ধানোয়ার। বলে, 'হো সাকতা, হো সাকতা। তুমি তো সপেরা। তুমি সাঁপের গন্ধ মালুম করতে না পারলে আর কে পারবে।'

জগলাল খুশীই হয়। বলে, 'থোড়া ঠহর যাও ধানবার ভেইয়া। গর্ত থেকে থুথুরবাটাকে বার করে নি।'

রামিয়া এখনও তুমড়ি বাঁশি বাজিয়েই চলেছে। জগলাল এবার একটা ঝোলা থেকে কী সব শেকড়-টেকড় বার করে গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। তারপর চোখ বুজে বিড় বিড় করে কী বলে যায়। খুব সম্ভব সাপের মন্ত্র।

এইভাবে অনেকটা সময় কাটে কিন্তু জগলালের এত চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায়। মাটির গভীর তলদেশ থেকে থুথুরবা বেরিয়ে আসে না।

জগলাল বলে, 'শালে হারামী, নহী নিকলেগা। চল, অন্য কোথাও দেখি।'

অফুরন্ত আশা বা উৎসাহ জগলালের; কোন কারণেই বুঝি হতাশ হয় না। কাঁধে সাপের ঝাঁপিগুলো তুলে নেয় সে। বাকী পোঁটলা-পুঁটলিগুলো হাতে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ায় রামিয়া। তু'জনে নয়ানজুলির শুখা খাত ধরে খাড়া পশ্চিমে হাঁটতে থাকে। ধানোয়ারও তাদের সঙ্গ নেয়।

খানিকটা যাবার পর আরেকটা গর্ত দেখে থেমে যায় জগলালরা। ব্যস্তভাবে ঝাঁপি-টাপি নামিয়ে গর্তটার ওপর ঝুঁকে পড়ে জগলাল। সেটা লক্ষ্য করতে করতে তার চোখ চকচকিয়ে ওঠে। জোরে জোরে

শ্বাস টেনে মাটি শুঁকতে শুঁকতে বলে, 'ধানবার ভেইয়া, এটা কীসের গর্ত জানো ?'

'নহী—' ধানোয়ার মাথা নাড়ে।

'সাঁপের গর্ত।'

এদিকে রামিয়া তার কাঁধের ঝোলাঝুলি নামিয়ে তক্ষুনি গাল ফুলিয়ে তুমড়ি বাঁশিতে ফুঁ লাগায়। আর আগের মতোই পোঁটলা থেকে শেকড়বাকড় বার করে গর্তের মুখে রাখতে রাখতে জগলাল বলে, 'আজ বহোত সৌভাগ ধানবর ভেইয়া। এই যে গর্তটা দেখছ, এটা কোন্ সাঁপের জানো ?'

'কোন্ ?' ধানোয়ার শুধোয়।

খুবই উত্তেজিত স্বরে জগলাল বলে, 'গেহুমন (কেউটে)। মাটির গন্ধ্ থেকে মালুম হচ্ছে, সাঁপটা বেশি নীচে যায় নি ; দো-চার হাতের মধ্যেই আছে। হো রামজী তেরে কিরপা—' বলে বিড়বিড় করে আবার আগের মতো মন্ত্র পড়তে শুরু করে।

বেশ খানিকটা সময় এভাবে কেটে যায়। তারপর অসীম দুঃসাহসে গর্তের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেয় জগলাল এবং চোখের পলকে একটা সাপের লেজ ধরে বার করে আনে।

জগলাল যা বলেছিল ঠিক তাই। সাপটা গেহুমনই। কমসে কম হাত তিনেক তো হবেই ; গায়ে কালোর ওপর সাদা সাদা চক্কর। ধানোয়ারের এতক্ষণে পুরা বিশ্বাস হয় গন্ধ শুঁকে সত্যি সত্যিই সাপ চিনতে পারে জগলাল। সে একেবারে তাজ্জব বনে যায়।

শীতের নির্জীব সাপ হলে কী হবে, জাতে তো গেহুমন। অসময়ে ঘুম ভাঙাবার জন্য সেটা ক্ষেপে ওঠে। মাটিতে ছেড়ে দিতেই সাপটা লেজের ওপর ভর দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ে। তার বিরাট ফণা অল্প অল্প দুলতে থাকে। লাল কাচের দানার মতো দুই চোখ আক্রোশে জ্বলতে থাকে।

জগলাল সাপটার দিকে হাত বাড়িয়ে নাচাতে নাচাতে বলে, 'এ শালে জেনানা সাঁপ। বহোত তেজ—'

সাপটা প্রচণ্ড রাগে জগলালের হাত লক্ষ্য করে ছোবল মারে কিন্তু অদ্ভুত এক যাদুকরের মতো তার আগেই হাত সরিয়ে নেয় জগলাল এবং সাপের মুখ গিয়ে পড়ে মাটিতে। তক্ষুনি বিদ্যুৎগতিতে এক হাতে সাপটার গলা, অন্য হাতে লেজের কাছটা টিপে ধরে একটা ছোট ঝাঁপিতে পুরে ফেলে জগলাল। বলে, 'গেহুমনের জহরের (বিষ) চড়া দাম। চার পাঁচ রোজের জন্যে আর চিন্তা নেই।' অসীম উত্তেজনায় তার গলা কাঁপতে থাকে। কয়েকটা দিনের জন্য পেটের দুশ্চিন্তা থাকবে না, তাদের মতো হাভাতেদের কাছে এটা সহজ ব্যাপার নয়।

সাপটাকে ঝাঁপিতে পুরে ফেলার পর আর দাঁড়ায় না জগলাল। পোঁটলা-পুঁটলি ফের কাঁধে চাপিয়ে বলে, 'চল ধানবার ভেইয়া। আজকের মতো আমার কাম খতম।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা পাক্কীতে এসে ওঠে। জগলাল বলে, 'তুমনি লৌট যাও ভেইয়া।'

'তোমরা ফিরবে না ?'

'নহী। আমরা এখন সিধা পূর্ণিয়া যাব। সাঁপের জহর বেচে কাল ফিরব।'

জগলাল এবং রামিয়া সোজা হাঁটতে থাকে। ধানোয়ার দাঁড়িয়ে পড়ে। অনেক দূরে পাকা সড়কের বাঁকে যখন এক সপেরা এবং তার আওরত অদৃশ্য হয় সেই সময় ঘুরে দাঁড়ায় ধানোয়ার। জগলালেরা যেদিকে গেছে তার উল্টোদিকে তাকে যেতে হবে। এখন কম করে 'কোশ'ভর হাঁটতে হবে।

লৌরি, বয়েল এবং ভৈসা গাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সন্ধে নেমে গিয়েছিল, কখন পৌষের হিমবর্ষী আকাশের নীচে

কুয়াশা জমতে শুরু করেছিল, পুরোপুরি খেয়াল ছিল না ধানোয়ারের। হঠাৎ মাথার ওপর উড়ন্ত অগুনতি কাঁক পাখির চিৎকারে চমকে উঠে সে। দেখতে পায়, তাদের সেই কাচ্চীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। সড়কের ওপারে গিয়েই তার নজরে পড়ে, নয়ানজুলির ঢালে একটা বড় পীপর গাছের তলায় ডিবিয়া জ্বলছে এবং সেখান থেকে ফুটন্ত ভাতের গন্ধ আসছে। ওখান থেকে আওরতের হাসি এবং একটা পুরুষের গলাও ভেসে আসছে। ধানোয়ার দাঁড়িয়ে পড়ে। কতকাল পর সে ভাতের গন্ধ পেল।

এই সন্ধ্যায় এখানে কে ভাত ফোটাচ্ছে? ডিবিয়ার আলো থাকলেও কুয়াশা এবং অন্ধকার বড় গাঢ়। ভাল করে ঠাওর করতে ধানোয়ার দেখতে পায় পহেলবান মখেলি সিং কী সব মজার কথা বলছে আর ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির পাশে বসে নাথুনি হেসে হেসে ঢলে পড়ছে। তার পরনে একটা নতুন জগমগ জগমগ শাড়ি। একটু দূরে বসে তার ভোলাভালা মরদ গৈয়ারামও হাসছে।

মানুষ এবং জগৎ সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞ ধানোয়ার প্রথমটা অবাক হয়ে যায়। পরক্ষণেই কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা থেকে নাথুনিদের চলে আসার কারণটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কতটা দাম দিয়ে নাথুনিরা ভাত খেতে পাচ্ছে সেটাও তার কাছে আর অস্পষ্ট নয়।

ধানোয়ারের হঠাৎ মনে পড়ে, পনের বিশ দিন সে ভাতের মুখ দেখে নি। কষ্টে তার বুকের ভেতরে শ্বাস আটকে যায় যেন। মনে মনে বলে, 'হো রামজী, হো বিষুণজী, হামনিকো বড়া দুখ—'

॥ পনের ॥

আরো কয়েকটা দিন কেটে যায়।

অঘান মাসের শেষ দিকে ধানোয়াররা ভাতের সন্ধানে দক্ষিণের এই ধানের দেশে চলে এসেছিল। দেখতে দেখতে পুষ (পৌষ) মাসেরও দশ বারোটা দিন কেটে গেল।

চারদিকের ক্ষেতিগুলো থেকে এখনও সব ধান উঠে যায়নি। তবে বেশির ভাগ মাঠই ফাঁকা হয়ে গেছে। জমিতে এখনও যা ফসল আছে তা তুলতে কম করে আরো সাত আট দিন লেগে যাবে।

মুসহর আর আদিবাসী মরসুমী কিষাণেরা আগের মতোই রোদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতিতে চলে আসে। সারা দিন ধান কেটে সন্ধেবেলা ফসল বোঝাই গৈয়া আর ভৈসা গাড়ির পেছন পেছন মালিকদের খলিহানে চলে যায়। সব কিছুই আগের নিয়মে চলছে।

পুষ অর্থাৎ পৌষ মাস পড়তেই বাতাস আরো হিমেল হয়ে উঠেছে, কুয়াশা আরো ভারী হয়ে নামে আজকাল। হিমের স্তর ঠেলে তিন হাত দূরেও এখন নজর চলে না।

দক্ষিণের সেই বিলে সেদিন ধানোয়ারদের যাওয়াই সার হয়েছিল। পাক্কীর ওধারের হাভাতেরা তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে। কাজেই এদিকের জঙ্গলেই তাদের যেতে হচ্ছে, যেতে হচ্ছে কাচ্চীর পেছন দিকের মজা বিলে। যতদিন না মাঠে নামা যাচ্ছে ঐ বিল আর জঙ্গলই আপাতত তাদের ভরসা।

জঙ্গল থেকে ধানোয়ারেরা যোগাড় করে আনে সুথনি, তেলাকুচ, কচু, মেটে আলু এবং বুনো ধুধুর। টক বুনো কুলও এনেছে ক'দিন। বিল ছেঁকে তুলে এনেছে মুংরি মাছ, কচ্ছপ। সর্বন আর সাবুই

ঘাসের ঝোপ থেকে ডাহুক আর বগেরিও মেরে এনেছে বার কয়েক। আর মেরে এনেছে খেরোহা (খরগোস)।

জঙ্গলে পয়লা দিন সেই যে মারাত্মক একটা সাপ দেখা গিয়েছিল, তার পর আর কোন খতারনাক জানোয়ার ধানোয়ারদের চোখে পড়েনি। দু'দিন তারা আট দশটা শিয়ারের দুটো দলকে দৌড়ে পালাতে দেখেছে। আর একদিন জঙ্গলে ঢুকবার মুখেই দেখা গিয়েছিল একটা বুনো দাঁতাল শুয়োর। শুয়োরটা তাদের দেখতে পায়নি; আস্তে আস্তে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছিল।

এর মধ্যে দু'দিন আরো একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। লাখপতিয়া দু'দিনই কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় ছিল না; সামনের নহর থেকে লোটা ভরে 'পীনেকো পানি' অর্থাৎ খাওয়ার জল আনতে গিয়েছিল। সেই সময় আস্তে আস্তে লাখপতিয়ার বুড়ী সাস ধানোয়ারেয় গা ঘেঁষে বসে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলেছে, 'এ ধানবার—'

এই সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় প্রায় পনের ষোল দিন এই হাভাতের দল একসঙ্গে রয়েছে কিন্তু কখনও যেচে বুড়ী ধানোয়ারের সঙ্গে কথা বলেনি। ফলে রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল ধানোয়ার। বুড়ীর দিকে তাকিয়ে শুধিয়েছে, 'কী বলছ?'

'এক গো বাত—'

'বল।'

'গুস্‌সা হবি না তো?'

'নায় নায়।'

বারকতক ঢোক গিলে বুড়ী বলেছে, 'ঐ যে লাখপতিয়া—মতলব হামনিকো পুতহু—'

ধানোয়ার বলেছে, 'হাঁ—'

'পুতহুটা ছাড়া ইস দুনিয়ামে আমার আর কেউ নেই।'

ধানোয়ারের ভুরু আর কপাল কুঁচকে গেছে। সে বুঝতে পারছিল

বুড়ী এই যে ধানাই পানাই শুরু করেছে তার পেছনে একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে সে বলেছিল, 'হামনি জানতা হ্যায়। আসলে যা বলতে চাও বলে ফেল।'

বুড়ী এবার বলেছে, 'তোরা রোজ জঙ্গলে যাস—'

'জঙ্গলে না গেলে খাব কী?'

'লেকেন আমার বুক কাঁপে। তুলোগন যব তক নায় লৌটতা (ফিরে না আসস) হামনিকা এত্তে ডর লাগতা কা কহোগী!'

ধানোয়ার জানায় ভয়ের কিছু নেই। তারা এত আদমী এক সঙ্গে জঙ্গলে যায়। সবার হাতেই লাঠি দা বা টাঙ্গি থাকে। খতারনাক জানবররা তাদের কিছুই করতে পারবে না।

গলার স্বর খানিকটা উঁচুতে তুলে লাখপতিয়ার শাশুড়ী এবার বলেছে, 'নায় নায়, খতারনাক জানবরের কথা বলছি না।'

'তব্?'

'তোর আর লাখপতিয়ার কথা বলছি।'

'কী কথা!' রীতিমত তাজ্জবই বনে গেছে ধানোয়ার।

লাখপতিয়ার শাশুড়ী বলেছে, 'জঙ্গল থেকে আমার পুতহুটাকে নিয়ে তুই কোথাও ভেগে যাস না। ওকে ভাগিয়ে নিলে আমি মরে যাব। বিলকুল ভুখা মর যায়েগী।'

বুড়ী যে এরকম একটা কথা বলবে, ভাবতে পারেনি ধানোয়ার। অনেকক্ষণ থ হয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থেকেছে সে। তারপর বলেছে, 'নিজের পেটের দানাই জোটাতে পারি না। আওরত ভাগিয়ে নিয়ে কী করব আমি? ভেবো না, তোমার পুতহু তোমারই থাকবে।'

ধানোয়ারের কাঁধে মাংসহীন শীর্ণ হাত রেখে কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বুড়ী বলেছে, 'সচ বলছিস তো?'

সেদিন রাত্রে লাখপতিয়া ভগোয়ানের নামে কসম খেয়ে বলার পরও সন্দেহ এবং দুশ্চিন্তা যাচ্ছিল না বুড়ীর। ধানোয়ার বলেছে, 'হাঁ হাঁ, সচ।'

ধানোয়ারের কাঁধে বুড়ীর শুকনো গাঁটপাকানো সরু সরু আঙুল-গুলো কাঁপতে থাকে। বিড় বিড় করে ঝাপসা গলায় সে বলে, 'রামচন্দজী কিষুণজী তোর ভালাই করবে।'

যাই হোক, জঙ্গল থেকে হাভাতেরা যে কচুঘেঁচু, মেটে আলু, সুথনি, কচ্ছপ বা পাখি, অর্থাৎ যা যা নিয়ে আসে সে সব খেয়ে সবার মুখ হেজে গেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। চোখের সামনে মাঠ জুড়ে লক্ষ কোটি সোনার দানা, অথচ তা ছোঁবারও উপায় নেই।

কচুঘেঁচু পুড়িয়ে ঝলসে বা সেদ্ধ করে, নুন মিশিয়ে সকলে চুপচাপ খেয়ে যায়। কিন্তু লাখপতিয়ার বুড়ী শাশুড়ী আর পরসাদীর বাচ্চাদুটো রোজ খাবার সময় ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দেয়।

'নহী খায়েগা, নহী খায়েগা। গরম ভাত্তা দে—'

রোজই তাদের বোঝানো হয়, আর ক'টা দিন, তারপর জরুর দু'বেলা পেট ভরে ভাত খেতে দেওয়া হবে। এই সান্ত্বনার কথা আগেও তারা কয়েক হাজার বার শুনেছে। তাই আর বিশ্বাস করে না। তাদের ধৈর্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অবুঝ বুড়ী এবং বাচ্চা দুটো সমানে মাথা ঝাঁকায় আর বলে, 'নহী। আভি গরম ভাত্তা দিতে হবে। আভি আভি আভি—'

আজ দুপুরে সুথনি সেদ্ধ এবং টক কুল ছাড়া খাবার মতো আর কিছুই নেই। সেগুলো দেখামাত্র বুড়ী আর পরসাদীর ছৌয়া দুটো সমানে চিৎকার জুড়ে দেয়। হাজার বুঝিয়েও যখন কিছুই হয় না তখন লাখপতিয়া বুড়ীকে বলে, 'এখন এগুলো খেয়ে নে। রাতমে জরুর গরমভাত্তা মিলেগা।'

'সচ বলছিস ?'

'হাঁ হাঁ সচ।'

কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় ভুখা আধনাঙ্গা মানুষ-

গুলো ভাবল অন্য সব দিনের মতো লাখপতিয়া বুড়ীকে স্তোক দিচ্ছে। তারা কিছু বলে না।

পরসাদীর ছৌয়া দুটো আচমকা গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বুড়হী গরমভাত্তা খাবে। আমরাও খাব—'

পরসাদী লাখপতিয়ার মতোই বলে ওঠে, 'খাবি খাবি, আগে রাত হোক।'

তারপর সারাটা দিন লাখপতিয়ার বুড়ী সাস এবং পরসাদীর ছৌয়া দুটো 'ভাত ভাত' করে অনবরত ঘ্যান ঘ্যান করে যায়।

লাখপতিয়া দুপুরে তার সাসকে যা বলেছিল সেগুলো শুধু কথার কথাই না। শাশুড়ীকে সে আজ ফাঁপা সান্ত্বনা বা স্তোক দেয় নি।

রাত্তিরে 'ঘুরে'র আগুনের চারপাশে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে আস্তে আস্তে মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে বুড়ীর গলা শোনা যায়, 'বহু—'

ঘাড় ফেরাতেই চোখাচোখি হয়। বুড়ী তা হলে জেগেই আছে। লাখপতিয়া বলল, 'কা ?'

বুড়ী শুধোয়, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

সতর্কভাবে চারিদিক দেখে নিল লাখপতিয়া। তারপর বুড়ীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ধানের ক্ষেতিতে।'

'ঘুরে'র আগুনের আভায় বুড়ীর মুখটা চক চক করতে থাকে। লুব্ধ গলায় সে বলে, 'কা রে, ধান চুরাতে (চুরি করতে) যাচ্ছিস ?'

'হাঁ। ভাতের জন্যে আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছিস না ? না চুরালে তোকে ভাত খাওয়াব কী করে ? চুপচাপ শুয়ে থাক। আমি যাব আর আসব।'

'লেকেন—'

'ফির কা ?'

লোভের বদলে বুড়ীর চোখেমুখে এবার ভয়ের ছায়া পড়ে। সে বলে, 'পেহরাদাররা ক্ষেতিতে বসে আছে।'

'থাক।' লাখপতিয়া জানায়, পাহারাদারদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে জরুর ধান নিয়ে আসবে। ধানের জন্য আজ সে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

'হোঁশিয়ার—'

'হাঁ হাঁ, বহোত হোঁশিয়ার। তুই এখন ঘুমো—' বলে বুড়ীর মুখের ওপর সযত্নে কম্বলটা টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় লাখপতিয়া। সে জানে হাভাতেদের কেউ এখন জেগে নেই। কাঁথা বা ধুসো কম্বল মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে সবাই ঘুমোচ্ছে।

মাথার ওপর কড়াইয়া গাছের ডালে থেকে থেকে কর্কশ গলায় কামার পাখিরা ডেকে উঠছে। এ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই।

কালো কম্বলে নিজের গোটা শরীর ঢেকে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে কাচ্চী পেরিয়ে ধানক্ষেতের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় লাখপতিয়া। আলের দিকে পা বাড়াতে যাবে সেই সময় উত্তুরে হাওয়ায় কার ফিসফিসে চাপা গলা কানে ভেসে আসে, 'এ লাখপতিয়া—'

চমকে মুখ ফেরাতেই লাখপতিয়া দেখতে পায়, ঠিক পেছনেই পরসাদী দাঁড়িয়ে আছে। পুরো শরীর কাঁথায় জড়ানো। আওরতটা কখন 'ঘুরে'র পাশ থেকে উঠে এসেছে টের পাওয়া যায়নি। লাখপতিয়া শুধোয়, 'তু !'

'হাঁ, হামনি—' আস্তে মাথা নাড়ে পারসাদী। বলে, 'কা করে। ছৌয়া দুটো ভাত ভাত করে রোজ কাঁদে। আজ দুপুরে ঠিকই করে রেখেছিলাম রাত্তিরে সবাই ঘুমোলে ধান চুরাবো। ছৌয়া দুটোর কান্না আর সইতে পারি না।'

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে লাখপতিয়া। বলে, 'আমারও তো একই হাল, বুড়ী সাসটা ভাতের জন্যে মরছে—'

'হাঁ, এখন চল্‌।'

দু জন কাঁচা সড়ক থেকে ধানক্ষেতের আলে নেমে আসে। ধানের জন্য মাঠের ভেতর অনেকটা যেতে হবে। কমসে কম আধ রশি তো নিশ্চয়ই। কেননা কাচ্চীর ধারে যে জমিগুলো, তার সব ফসল উঠে গেছে।

অন্য দিনের মতো চারদিকের ক্ষেতিতে উঁচু মাচায় হ্যাজাক জ্বলছে। পাহারাদারদের ঘুমজড়ানো গলা মাঝে মাঝে ভেসে আসছে, 'হোঁশিয়ার—'

ক'দিন আগে আকাশে পুনমের চাঁদ ছিল। এখন বোধহয় অমাবস্যা। অন্ধকার আর কুয়াশায় সমস্ত চরাচর ডুবে আছে। তবে সমস্ত অন্ধকার ছুঁচের মতো ফুঁড়ে হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে।

লাখপতিয়া বলে, 'খাড়া হয়ে হেঁটে যাওয়া যাবে না। পেহরাদারদের চোখে পড়ে যাব।'

পরসাদী বলে, 'তব্ ?'

'আমি যেভাবে যাচ্ছি সেইভাবে আয়—' বলে আলের ওপর উবু হয়ে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়। তার পেছন পেছন পরসাদীও একই ভাবে চলতে থাকে।

কুয়াশায় আলের ঘাস ভিজে আছে। হিমালয় এখান থেকে খুব দূরে নয়। উত্তুরে হাওয়া সারা গায়ে সেখান থেকে হিম জড়িয়ে ছুটে আসছে।

এতক্ষণ 'ঘুরে'র পাশে ছিল বলে ঠাণ্ডাটা তত টের পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখন লাখপতিয়াদের মনে হচ্ছে হাত-পায়ের আঙুল, নাক কান—সব যেন খসে পড়বে; গায়ের চামড়া ফেটে যাবে। হাওয়া থেকে, কুয়াশা থেকে কনকনে হিম চামড়ার লাখ লাখ সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে রক্তের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে যেন।

অনেকটা যাবার পর ফসলভর্তি একটা জমি পাওয়া গেল। জন্তুদের মতো চার হাত-পায়ে সেখানে নেমে যায় লাখপতিয়ারা।

কোমরে দু'জনেই ধারাল ছুরি বেঁধে নিয়ে এসেছিল। বাঁ হাতে ধানের গোছা মুঠো করে ধরে যেই কাটতে যাবে আচমকা কাছের একটা মাচা থেকে এক পাহারাদার চেঁচিয়ে ওঠে, 'কৌন? কৌন রে?'

হারামজাদকা ছৌয়াগুলোর দু চোখে যেন গিধের নজর। ঘন কুয়াশা হোক, গাঢ় আন্ধেরা থাক, সব ভেদ করে ওদের নজর চলে। খুব সম্ভব দশ 'মিল' তফাত থেকে ওরা সব-কিছু দেখতে পায়। ভয়ে পরসাদী আর লাখপতিয়ার বুকের ভেতরটা জমাট বেঁধে যায়, কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে কাচ্চীর দিকে দৌড়ুতে শুরু করে।

এদিকে পাহারাদারটা তুমুল চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, 'চোর-চোর-চোর। ভাগতা হ্যায়, পাকড়ো—'

বিশাল মাঠের চার পাশের অগুনতি মাচান থেকে অন্য পাহারাদাররাও চেঁচাতে থাকে, 'চোর-চোর—'

একসময় পরসাদী আর লাখপতিয়া দেখতে পায়—পুব-পশ্চিম আর দক্ষিণ দিক থেকে দেড় দুশো পাহারাদার দৌড়ে আসছে। শরীরের সবটুকু শক্তি পায়ে জড়ো করে দু'জনে ছুটতেই থাকে, ছুটতেই থাকে। কিন্তু কাচ্চী পর্যন্ত যাবার আগেই পাহারাদাররা তাদের ঘিরে ফেলে। ভয়ে আতঙ্কে দু'হাতে মুখ ঢেকে এই ভয়ঙ্কর শীতের রাতেও দুটো মেয়েমানুষ গল গল করে ঘামতে থাকে।

পাহারাদাররা চিৎকার করে বলে, 'কৌন তোরা? অ্যাই, মুহ্‌সে হাত হটা—'

ভয়ে ভয়ে হাত সরায় লাখপতিয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাহারাদার তাদের মুখে টর্চের আলো ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে। বলে, 'কলিজায় সাহস আছে শালীদের। ভুচ্চরের বাচ্চাগুলো—'

আরেকটা পাহারাদার গর্জে ওঠে, 'তোদের না বলেছি, ধান উঠবার পর ক্ষেতিতে নামবি।'

লাখপতিয়া বা পরসাদী, কেউ উত্তর দেয় না।

অন্য একটা পাহারাদার লোহার গুলবসানো ভারী লাঠি ঠুকে মারার জন্য তেড়ে আসে। অন্যরা তাকে থামিয়ে দেয়, 'আওরত হ্যায়। গায়ে হাত উঠিও না।'

পাহারাদারটা ক্ষেপে যায়, 'হাত ওঠাতে তো বারণ করছ! তবে কি চোরের বাচ্চাদুটোকে এমনি এমনি ছেড়ে দেব!'

'নহী—' একটা ঠাণ্ডা মাথার পাহারাদার এগিয়ে এসে বলতে থাকে, 'এমনি ছাড়া হবে না। কুছ তো করনাই পড়ে।' বলেই টান মেরে কাঁথা কম্বল আর পরনের কাপড় খুলে লাখপতিয়া এবং পরসাদীকে পুরো উলঙ্গ করে দেয়। তারপর আবার শুরু করে, 'পয়লা বার বলে স্রিফ নাঙ্গা করে ছেড়ে দিলাম। ফের ধান চুরাতে এলে কী করব জানিস—' বলে মারাত্মক 'বুরা' কতকগুলো ইঙ্গিত দিতে দিতে মেয়েমানুষ দুটোর নোংরা কাপড়চোপড় পাশের ক্ষেতিতে ছুঁড়ে দেয়।

অন্য পাহারাদাররা খ্যাল খ্যাল করে হাসতে হাসতে পৌষের নির্জন ঘুমন্ত প্রান্তরে হিমার্ত বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে।

এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে যায় যে প্রথমটা একেবারে থ হয়ে গিয়েছিল লাখপতিয়ারা। শরীরে তাদের সাড় ছিল না যেন। হঠাৎ হুঁশ হতে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যায়। পরক্ষণে এক হাতে বুক ঢেকে আরেক হাত দিয়ে কাপড়চোপড় কুড়িয়ে দৌড়ুতে থাকে।

পাহারাদাররা তাদের ছেড়ে দেয় না। পিছু পিছু তাড়া করে আসতে থাকে। ওদের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে, 'জানবর-গুলোকে কাচ্চী থেকে হটাতে হবে। নায় তো ফির ধান চুরানে আয়েগী—' কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা থেকে হাভাতেদের উৎখাত করে ধানচুরির সম্ভাবনাটা একেবারেই শেষ করে দিতে চাইছে ওরা।

ওদিকে চিৎকার আর হৈচৈ শুনে 'ঘুরে'র চারপাশে হাভাতেদের

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যে কী ঘটেছে ঠিক বুঝতে না পেরে তারা আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা নিয়ে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে। একসময় অবাক হয়ে দেখতে পায়, লাখপতিয়া আর পরসাদী দৌড়ে আসছে। তাদের গায়ে একটা সুতোও নেই।

ওদের দেখে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। লাখপতিয়ার বুড়ী সাসের চোখে তেজ না থাকলেও উলঙ্গ পুতহু আর পরসাদীকে দেখতে পেয়েছিল। আচমকা ডুকরে কেঁদে ওঠে সে। বাতাস, গাঢ় অন্ধেরা আর কুয়াশা ফুঁড়ে ফুঁড়ে তার কান্নার শব্দ বহুদূর ছড়িয়ে যেতে থাকে। বুড়ীর দেখাদেখি পরসাদীর বাচ্চাদুটোও তুমুল চিৎকার জুড়ে দেয়।

উদ্বিগ্ন মুখে টহলরাম শুধোয়, 'কা হুয়া? এ পরসাদী, এ লাখপতিয়া—কৌন তুলোগকা অ্যায়সা বুরা হাল কিয়া?'

উত্তর না দিয়ে গাছগুলোর পেছনে চলে যায় দুই মেয়েমানুষ। একটু পরেই কাপড়-টাপড় গায়ে জড়িয়ে 'ঘুরে'র পাশে এসে বসে। ততক্ষণে পহেলবানেরা ক্ষেতি থেকে উঠে এসেছে। তারা বলে, 'এত হোঁশিয়ারি দিলাম তবু তোরা কানে তুললি না। তোদের দো আওরত ধান চুরাতে ক্ষেতিতে নেমেছিল। ভূচ্চরের দল, কিরপা করে তোদের এখানে থাকতে দিয়েছি। লেকেন আর না। ভাগ শালে চুহার বাচ্চারা—আভি ইধারসে ভাগ যা—'

রামনৌসেরা এবং ধানোয়ার থেকে শুরু করে সবাই পহেলবানদের হাতে পায়ে ধরতে থাকে। বলে, দিনের পর দিন ভাত না খেতে পেয়ে পরসাদীর বাচ্চাদুটো আর লাখপতিয়ার বুড়ী শাশুড়ী ওদের দু'জনকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। মাথার ঠিক ছিল না ওদের, তাই ধানক্ষেতে নেমেছিল। এবারের মতো মাফ করে দেওয়া হোক। সবাই কথা দিচ্ছে, ফসল ওঠার আগে কেউ আর জমিতে নামবে না।

অনেক কাকুতি-মিনতি এবং ধরাধরির পর পহেলবানেরা খানিকটা নরম হয়। নতুন করে আরেক বার হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা ফের ক্ষেতির দিকে চলে যায়।

হাভাতেরাও আর বসে থাকে না। রামনৌসেরাই তাড়া দিয়ে দিয়ে সবাইকে শুইয়ে দেয়।

অনেকক্ষণ পর ভাঙা বসা গলায় লাখপতিয়ার সাস লাখপাতিয়াকে ডাকে, 'বহু—'

লাখপতিয়া ঘুমোয় নি; কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটার কথাই সে ভাবছিল। চমকে সাড়া দেয়, 'কা ?'

'পহেলবানরা তোকে নাঙ্গা করে দিল; তোর বেইজ্জতি করল। আমি আর ভাত চাইব না বহু।' বলে কাঁদতে থাকে বুড়ী। তার স্বর ক্রমশ বুজে যায়।

বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে লাখপতিয়ার। সে কিছু বলে না।

বুড়ী আবার শুরু করে, 'হামনিকো ভাতকা জরুরত নহী। অমন ভাত খাওয়ার মাথায় তিনবার লাথ, তিন বার থুক।' বলতে বলতে সমানে ফোঁপাতে থাকে। তারই ভাতের ব্যবস্থা করতে গিয়ে পহেলবানদের হাতে পুতহুর যে জঘন্য অসম্মান হয়েছে তাতে কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে বুড়ীর।

গভীর মমতায় শাশুড়ীকে বুকের ভেতর টেনে এনে লাখপতিয়া বলতে থাকে, 'চুপ হো যা, চুপ হো যা—' তার গলাও ঝাপসা হয়ে আসে। চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে থাকে।

॥ ষোল ॥

সব ধান উঠবার পর এ অঞ্চলের জমি-মালিকেরা আরা, সাহারসা বা সুদূর মীর্জাপুর থেকে নৌটঙ্কীর দল আনিয়ে সস্তা নাচগানের আসর বসিয়ে দেয়। এই সময়টা খামার-বাড়ির খলিহানগুলো ফসলে বোঝাই থাকে, ক্ষেতিমালিকদের মেজাজও দরাজ হয়ে যায়। সারা বছর যারা তাদের জমিতে খাটে সেই মুসহর আর শীত মরসুমের ধান-

কাটানিদের জন্য দুটো পয়সা খরচ করে আমোদের একটু ব্যবস্থা করতে তাদের ভালই লাগে। অবশ্য মুসহর বা ক্ষেতমজুররাই শুধু না, নৌটঙ্কীর গন্ধ পেলেই চার পাশের দেহাতী মানুষেরা ভেঙে পড়ে। এই সামান্য আনন্দটুকুর জন্য সারা বছর ধরে এইসব গরীব 'গাঁও কা আদমী'রা উন্মুখ হয়ে থাকে।

এ বছর সবার আগে মৈথিলী বামহন ভানচন্দ ঝায়ের জমিগুলো থেকে সব ফসল উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভানচন্দ সাহারসা থেকে নৌটঙ্কীর দল আনার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। আজ থেকে পর পর তিন রাত তারা গাইবে।

রাজপুত ত্রিলোকী সিং, কায়াথ বজরঙ্গী সহায় এবং যদুবংশছত্রি ঝামরলাল গোয়ারের জমি থেকে এখনও সমস্ত ফসল ওঠে নি। উঠলে ওঁরাও দু চার রাতের জন্য নৌটঙ্কীর আসর বসিয়ে দেবেন। পুরো শীতকালটা এখানকার বাতাসে মিঠে দেহাতী সুরে নৌটঙ্কীর মজাদার গানের সুর ভেসে বেড়াতে থাকবে।

পিপরিয়া গাঁয়ে ভানচন্দ ঝায়ের বিশাল কোঠির সামনের ফাঁকা জায়গায় নৌটঙ্কীর জন্য সামিয়ানা খাটানো হয়েছে—এই খবরটা হাওয়ায় হাওয়ায় লাখপতিয়াদের কাছেও পৌঁছে গেছে। ফলে কাচ্চীর ধারে কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় পঁচিশ তিরিশটা ভুখা হাভাতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারা ঠিক করে ফেলেছে, খোলা আকাশের তলায় 'ঘুরে'র চারপাশে শুয়ে না থেকে তিনটে রাত নৌটঙ্কীর গান শুনেই কাটিয়ে দেবে।

আজ সন্ধে হতে না হতেই খাওয়া চুকিয়ে গায়ে কাঁথা বা কম্বল জড়িয়ে সবাই পিপরিয়া গাঁয়ের দিকে বেরিয়ে পড়ে। সব চাইতে বেশি উৎসাহ রামনৌসেরার। কেননা একসময় নৌটঙ্কী দলের সঙ্গে সারা বিহার ঘুরে ঘুরে রাতের পর রাত নানা আসরে গেয়ে বেড়িয়েছে। এখনও তার গানের গলা আশ্চর্য মিঠে—যাকে বলে যাদুভরি।

পাকা সড়কের ওধারে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে 'রশি'ভর হাঁটলে পিপরিয়া গাঁ। পাকীর ওধারের ধানক্ষেতে গিয়ে ওরা দেখল, আরো অনেক মানুষ চলেছে। খবর নিয়ে জানা গেল, এই আদমীগুলোও তাদের মতোই নৌটঙ্কী শুনতে যাচ্ছে।

পিপরিয়া গাঁয়ে ভানচন্দ ঝায়ের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল, এ দিকের তাবৎ গাঁ-গঞ্জ নৌটঙ্কীর সামিয়ানার চারপাশে যেন ভেঙে পড়েছে। পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, সব দিক থেকে মচ্ছরের ঝাঁকের মতো মানুষ আসছে তো আসছেই।

বিরাট সামিয়ানায় কমসে কম চল্লিশ পঞ্চাশটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাচগানের জন্য সেটার মাঝখানে উঁচু মঞ্চ। মঞ্চটা ঘিরে অগুনতি চেয়ারে ভানচন্দ ঝা এবং তাঁর খাতির-দারির লোকেরা জাঁকিয়ে বসে আছেন।

সামিয়ানার তলায় ঢোকার উপায় নেই। তাগড়া চেহারার পহেলবানেরা মোটা মোটা লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছে। কেউ এগুতে গেলেই লাঠি ঠুকে গর্জে উঠছে, 'হট হট ভূচ্চরের দল। ইধর নহী, দূরসে দেখ্—

অর্থাৎ সামিয়ানা থেকে অনেকটা তফাতে খোলা আকাশের তলায় বসে নৌটঙ্কী শুনতে হবে।

সামিয়ানার কাছাকাছি বসবার জন্য এ অঞ্চলের দেহাতী মানুষ আর হাভাতেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। চিৎকারে এবং অশ্লীল ভাষার আদানপ্রদানে একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে। অগত্যা পহেলবানেরা দৌড়ে আসে। চড়-চাপড় মেরে, লাঠি চালিয়ে অবস্থা সামাল দেয়। ভয়ে ভয়ে লোকজন চুপচাপ যে যেখানে পারে বসে পড়ে।

পহেলবানেরা শাসায়, 'আর চেল্লামেল্লি করলে ঘাড়ের ওপর থেকে শির উড়িয়ে দেব, সমঝা ?'

লোকগুলো মাথা হেলিয়ে দেয় অর্থাৎ সমঝেছে। রাত একটু বাড়লে গান শুরু হয়ে যায়। সাহারসার নামকরা দল। দলের

সবাই ভাল গাইয়ে। তবু তার মধ্যে অল্পবয়সী যুবতী ছোকরিটার তুলনা নেই। কিবা তার চেহারা ; বিলকুল পরী য্যায়সা। যেমন তার চোখের ঠমক, তেমনি পতলী 'কোমরিয়া'র লচক। খুবসুরত যুবতীর পা, কোমর এবং চোখের তারা একই তালে নাচতে থাকে। সতেজ সুরেলা গলা থেকে যেন যাদু ঝরতে থাকে।

সে আসরে এলেই চারপাশের হাজার হাজার মানুষ চনমনিয়ে ওঠে। চোখেমুখে অদ্ভুত এক ঘোর নিয়ে তারা সম্মোহিতের মতো ছোকরি কলাকারের দিকে .তাকিয়ে থাকে। অনুভব করে রক্তের ভেতর দিয়ে অনবরত বিজরী চমকে যাচ্ছে।

নাচের তালে তালে ছোকরি গায় :

মোরি হটিয়াসে নাথুনিয়া কুলেল করেলা
দেখিকে সবোকে মানোয়া ডোল ডোলেলা
মোরি হটিয়াসে···

নাথুনি পাহান যব চলতি ডডরিয়া (রাস্তা)
দেখিকে লোকোয়া মারেলা নজরিয়া
হাঁসি হাঁসি ছৈলা লোক মেল তরেলা
মোরি হাটিয়াসে···

দেখিকে হামরো চড়ত জওয়ানী
লোকোয়াকে মুহ্য়ামে ভর যাত পানি
রহিয়ামে হামসে গুলেল করেলা
মোরি হটিয়াসে···

নজর গহ্‌রায় যব দেখায় সুরতিয়া
পাগল নিয়ার হৈল উনকে মাতিয়া
বাঁহিয়া পাকড়কে ঝুলেল তরেলা
মোরি হটিয়াসে···

ভোর রাতে নৌটঙ্কীর আসর ভাঙলে রামনৌসেরারা কড়াইয়া আর সিমার গাছের তলায় ফিরতে থাকে। রাত জাগার দরুন সবার

চোখ ঘুমে জুড়ে আসছে। এখন সোজা গিয়ে তারা শুয়ে পড়বে। দুপুরের আগে কেউ উঠবে বলে মনে হয় না।

ঝিমোতে ঝিমোতেই লাখপতিয়া ধানোয়ারকে বলে, 'ছোকরির গলা বহোত মিঠি।'

'হাঁ।' সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় ধানোয়ার। ঘাড় কাত করে বলে, 'গানা ভি বহোত বঢ়িয়া।' বলেই মোটা কর্কশ বেসুরো গলায় গেয়ে ওঠে :

দেখিকে হামরো চড়ত জওয়ানী
লোকোয়াকে মুহ্‌য়ামে ভর যাত পানি
রহিয়ামে হামসে গুলেল করেলা
মোরি হটিয়াসে নাথুনিয়া…

লাখপতিয়ার বুড়ী সাস খানিকটা আগে আগে হাঁটছিল। গানটা শুনে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমার পুতহুর চড়ত জওয়াণী (উগ্র যৌবন) দেখে মুহ্‌মে পানি আনিস না। তুই কিন্তু কসম খেয়েছিস ধানবার—'

ধানোয়ার ব্যস্তভাবে বলে, 'ঘাবড়াও মাত বুড়হী। আমার কোন 'বুরা' ধান্দা নেই। এ তো গানা—সিরিফ গানা হ্যায়।'

বুড়ী উত্তর দেয় না। তার চোখমুখ দেখে মনে হয়, ধানোয়ারের কথায় খুশী হয়েছে।

চুপচাপ খানিকক্ষণ হাঁটার পর ধানোয়ার হঠাৎ ডেকে ওঠে, 'এ বুড়হী—'

লাখপতিয়ার সাস তক্ষুনি সাড়া দেয়, 'কা ?'

'একগো বাত শুনে রাখ।'

'কা ?'

'পেটের দানা ছাড়া দুনিয়ায় আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। কুছ নহী।'

॥ সতের ॥

ধান কাটা এখনও চলছে।

চরাচর জুড়ে ক্ষেতিমালিকদের এত জমি আর জমিভর্তি এত অফুরন্ত ধান যে এক একসময় সন্দেহ হয়, কেটে সব শেষ করা যাবে কিনা।

কাজেই রামনৌসেরাদের রোজই জঙ্গলে যেতে হচ্ছে। রাত জেগে নৌটঙ্কী শোনার পর ওরা ভোরে ফিরে এসে কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ফলে তাড়াতাড়ি উঠতে পারে না। ঘুম ভাঙতে দুপুর হয়ে যায়। তার আগে কারো পক্ষে জঙ্গলে যাওয়া সম্ভব হয় না।

আজও পঙ্গু, 'বীমার', বুড়ো-বুড়ী আর বাচ্চাকাচ্চাদের গাছতলায় রেখে জঙ্গলে চলে গিয়েছিল হাভাতেরা।

প্রথম দিন জঙ্গল থেকে বুনো কলা নিয়ে গিয়ে রামনৌসেরার কথামতো সবাই ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। এমন কি যারা জঙ্গলে যেতে পারে নি তাদেরও সমান ভাগ দিয়েছিল। কিন্তু এই মহানুভবতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। জঙ্গল থেকে আজকাল তারা যা জুটিয়ে আনে তার অংশ অন্য কাউকে দেয় না। যে যা যোগাড় করে সেটা তার নিজস্ব।

জঙ্গলের ভেতরে এক 'রশি' জায়গা জুড়ে যত ফলফলারি, কচু, কন্দ, শাকপাতা, মৌচাকের মধু—এ ক'দিন হাভাতেরা সবাই তুলে নিয়ে গেছে। আজ খাদ্যের খোঁজে তাদের আরো গভীর জঙ্গলে ঢুকতে হল।

অন্য দিনের মতোই দল বেঁধে তারা এক জায়গায় থাকল না। নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

দক্ষিণের এই ধানের রাজ্যে আসার পর থেকে রোজই জঙ্গলে ঢোকার মুখে রামনৌসেরা যা বলে থাকে আজও তাই বলেছে, 'সবাই চারদিকে নজর রাখবি। জঙ্গলের ভেতরটা বহোত খারাপ জায়গা। কোই একেলা দূর নায় যানা।'

আজ গভীর জঙ্গলে ঢুকে প্রথমে সকলে কাছাকাছিই ছিল। কিন্তু বনভূমির ফলফলারি বা কচুঘেঁচু তো এক জায়গায় থাকে না। ফলে খাদ্যের খোঁজে সবাই চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

তা ছাড়া জঙ্গল যতই খতারনাক হোক না, কেউ চায় না তার সঙ্গে আর কেউ থাকুক। কারণ বাগনর, সুথনি, খেরোহা—যা-ই চোখে পড়ুক সঙ্গী তার ভাগ নেবে।

যে যেভাবে ইচ্ছা চলুক, জঙ্গলে এলে লাখপতিয়া কিন্তু ধানোয়ারের কাছছাড়া হয় না। সেই যে পাকা সড়কের ধারে পীপর গাছগুলোর তলায় তার সঙ্গে পয়লা দেখা তখন থেকেই লাখপতিয়া যেন তার গায়ের সঙ্গে জুড়ে আছে।

আজ লাখপতিয়া আর ধানোয়ার মৌমাছিদের চলাচল দেখে তাদের পিছু নিয়ে জঙ্গলের উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। ধানোয়ারের ধারণা, কোথাও না কোথাও মৌমাছিগুলো বাসা বানিয়েছে। মৌচাকটা খুঁজে বার করতে পারলে মধুর আশা আছে।

রামনৌসেরা বুনো ধুধুরের খোঁজ পেয়ে তা-ই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরসাদী পুব দিকের জঙ্গলে একটা বড় মেটে আলু দেখতে পেয়েছে। সেটা খুঁড়ে বার করতে হবে। তার থেকে কয়েক হাত দূরে একটা ঘন খেড়ি ঝোপের পেছনে ক'টা কুল গাছ দেখতে পেয়েছে লছমন। এই পৌষ মাসে গাছ ভর্তি কুল পেকে হলুদ হয়ে আছে। এমনি বাকী সবাই বনভূমির ভেতর কিছু না কিছু খাদ্যের খোঁজ পেয়েছে। যেভাবেই হোক জঙ্গলের দান এই খাদ্যগুলো তুলে নিয়ে তাদের ফিরতে হবে। এখন আর কোন দিকে তদের তাকাবার সময় নেই।

যাই হোক, পরসাদীর হাতে একটা বড় দা রয়েছে। মাটিতে চোট বসিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে সে মেটে আলুটা বার করতে যাবে সেই সময় একটা আওয়াজ কানে আসে, 'গর-র-র-র, গর-র-র—'

চমকে সামনের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায় পরসাদীর। হাত পনের তফাতে একটা মোটা পরাস গাছের গুঁড়ির ওপাশে প্রকাণ্ড একটা চিতা বসে আছে! আর তার দিকে তাকিয়ে গলার ভেতর থেকে জান্তব শব্দ বার করছে, 'গররর—গররর—' জানবরটার কটা চোখে দুনিয়ার সব হিংস্রতা।

কিছুক্ষণ পরসাদীর দিকে তাকিয়ে সমানে আওয়াজ করে গেল চিতাটা আর মাটিতে লেজ আছড়াতে লাগল। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে যেই ঘাত পাততে যাবে সেইসময় বুক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পরসাদী, 'মর গয়ী, মর গয়ী। বাচাও—'

খেড়ি ঝোপের আড়াল থেকে দৌড়ে এল লছমন। বলল, 'কা রে, কা হুয়া তুহারকা—' কথাটা আর শেষ করতে পারল না সে, তার আগেই চিতাটা ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে এক কামড়ে লছমনের ঘাড়টা ভেঙে আরো ঘন জঙ্গলের দিকে তার শরীরটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করবারও সময় পেল না লছমন।

শেষ মুহূর্তে শিকার বদল করে কেন যে চিতাটা লছমনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পরসাদী জানে না। আচমকা সব ভয় ঘুচে কোত্থেকে দুর্জয় সাহস এসে ভর করল তার ওপর। 'কে কোথায় আছ দৌড়ে এস। শের লছমন ভাইকে খতম করে দিয়েছে। জলদি চলা আও-ও-ও—' চেঁচাতে চেঁচাতে উন্মাদের মতো চিতাটার পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে জন্তুটার পিঠে কোমরে ঘাড়ে অনবরত দায়ের কোপ মেরে চলল।

পরসাদীর চিৎকারে জঙ্গলের চারদিক থেকে রামনৌসেরা, ধানোয়ার, ফিতুর্লাল, টহলরাম, লাখপতিয়া—এমনি সবাই হৈ-হৈ

করতে করতে দৌড়ে এল। এত মানুষের চেঁচামেচিতে চিতাটা লছমনকে ফেলে এক লাফে আরো গভীর জঙ্গলে উধাও হয়ে গেল।

পরসাদী কপাল চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'সিরিফ হামনিকো লিয়ে লছমন ভেইয়া খতম হো গিয়া। আমাকে বাঁচাতে এসে ও মরল—হো রামজী—'

আজ কচু, কন্দ, মেটে আলু ইত্যাদি জোটানো স্থগিত রেখে সবাই লছমনের মৃতদেহ কাঁধে করে বিকেলে কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় ফিরে আসে।

রক্তমাখা নিষ্প্রাণ লছমনকে দেখে এবং সব কথা শুনে অসহায় পঙ্গু ছনেরি মাটিতে কপাল ঠুকে ঠুকে রক্তারক্তি বাধিয়ে দেয়। দুর্বোধ্য জড়ানো গলায় সমানে চেঁচিয়ে যায়, 'অব্ হামনিকো কা হোগা? এখন আমার কী হবে?'

রামনৌসেরা বলে, 'ভগোয়ান ভরোসা। কাঁদিস না, কাঁদিস না। কেঁদে কী করবি?'

অন্য আওরতেরা ছনেরিকে ঘিরে বসে। বলে, 'ভগোয়ানকা মর্জি! হামনিলোগন কা করে! চুপ হো যা ছনেরিয়া, চুপ হো যা—'

সন্ধের পর সামনের নহরটার পাশে চিতা সাজিয়ে লছমনকে পূর্ণ মর্যাদায় পোড়ানো হয়। ছনেরিকে কাঁধে চাপিয়ে দক্ষিণে এই ধানের দেশে ছুটে এসেছিল সে। কিন্তু দু মুঠো ভাত খাবার আগেই তাকে শহীদ হতে হল।

আজ রাত্তিরে লছমনকে পুড়িয়ে আসার পর কেউ আর নৌটঙ্কী শুনতে যায় না। কড়াইয়া এবং সিমার গাছের তলায় পৌষ মাসের কুয়াশার চাইতেও ঘন হয়ে দুঃখ আর বিষাদ নামতে থাকে।

স্তব্ধ চরাচরে কোথাও কোন শব্দ নেই। কামার পাখিগুলো পর্যন্ত আজ আর চেঁচাচ্ছে না। শুধু গোঙানির মতো ছনেরির একটানা বিলাপ শীতের বাতাসে ছড়িয়ে যেতে থাকে, 'হামনিকো কা হোগা? হামনিকো কা হোগা?'

॥ আঠার ॥

জগতের কোন কিছুই অফুরন্ত নয়।

আজ জমি-মালিকদের ক্ষেতিগুলোতে ধান কাটা শেষ হয়। ফসল বোঝাই করে সন্ধের আগে আগে শেষ বয়েল গাড়িটিও চলে যেতে থাকে।

শেষ গাড়িটার পেছন পেছন মরশুমী ধানকাটানি আর পহেলবানেরা হাঁটছিল।

একটা পহেলবান চলতে চলতে ফাঁকা মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে হাভাতেদের বলে, 'এখন থেকে ক্ষেতিগুলোর মালিক তোরা। পেহরাদারি উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যা, নেমে পড় ভূচ্চরের দল—' বলতে বলতে সে এগিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে গৈয়া আর ভৈসা গাড়িগুলো নিয়ে পহেলবানেরা পাক্কীর ওধারে উধাও হয়ে যায়।

এদিকে কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় অদ্ভুত এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বুড়ো অথর্ব বীমারী থেকে শুরু করে বাচ্চা-কাচ্চা পর্যন্ত হাভাতেদের পুরো দলটা চনমনিয়ে ওঠে; তাদের বুকের ভেতর রক্ত ছলকাতে থাকে।

যে কারণে খরা বন্যা আর অজন্মার দেশ থেকে তারা এই ধানের রাজ্যে চলে এসেছে, এতদিনে তা পাওয়া যাবে। এবার তারা ভাত খেতে পাবে। কতকাল পর এই ভাত খাওয়া! হো রামজী, তেরে কিরপা!

বাঘের হাতে লছমনের মৃত্যু ক'টা দিন হাভাতেদের বিষণ্ণ করে রেখেছিল। কিন্তু প্রতিদিন পেটের দানার জন্য যাদের নিদারুণ যুদ্ধ, দুঃখ পুষে রাখার মতো সৌখিনতা তাদের মানায় না। কাল থেকে খেতে পাবে, এই ভাবনাটাই তাদের হঠাৎ চাঙ্গা করে তোলে, রক্তের মধ্যে বিজরী চমকের মতো কিছু বইয়ে দেয়।

সবাই একসঙ্গে এবার রামনৌসেরার দিকে তাকায়। আজ সকাল থেকেই ধুম জ্বর রামনৌসেরার। তাপে গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। লাল চোখে ঘোর লাগা চাউনি। 'ঘুরে'র আগুনের পাশে ভাল করে কম্বল জড়িয়ে মাথাটাথা ঢেকে বসে আছে সে।

ধানোয়ার রামনৌসেরাকে শুধোয়, 'অব কা করে ?'

রামনৌসেরা বলে, 'আজ থাক। আন্ধেরা আর কোহ্‌রাতে (কুয়াশা) ধান দেখতে পাওয়া যাবে না।'

সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করা হয়, একেবারে কাল সকাল থেকেই ক্ষেতিতে নামা হবে।

উত্তেজনায় রাত্তিরে ভাল করে কারো ঘুমই হয় না।

ভোরবেলা, রোদ উঠেছে কি ওঠে নি, কুয়াশা কেটেছে কি কাটে নি—ভুখা আধনাঙ্গা মানুষগুলো কাপড়ের ঝুলি আর সরু সরু কাঠি নিয়ে হুড়মুড় করে ফসলকাটা ফাঁকা মাঠে নেমে পড়ে। শুধু তিনজন বাদ। লাখপতিয়ার বুড়ী সাস, ছনেরি আর রামনৌসেরা। রাম-নৌসেরার জ্বরটা আজও ছাড়ে নি। হাঁটু থেকে নীচের দিকটায় তার যা পায়ের হাল তাতে এতটুকু নাড়াচাড়ারও উপায় নেই।

আলের ওপর দিয়ে সবার আগে আগে হাঁটছিল টহলরাম। আজ না আছে মুসহর ধানকাটানিরা, না আছে তাগড়া চেহারার পহেলবানরা, না ভৈসা বা বয়েল গাড়ি।

আদিগন্ত ফাঁকা মাঠের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে আকাশে দু হাত

ছড়িয়ে খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে টহলরাম, 'হামনিলোগ ক্ষেতিকো রাজা বন গিয়া।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, উঁচু আল দিয়ে ঘেরা চৌকো, তেকোণা, ছ' কোণা একেকটা ক্ষেতে ধানোয়াররা একেক জন নেমে জমি থেকে ঝড়তিপড়তি ধান আঙুল দিয়ে খুঁটে খুঁটে ঝুলিতে তুলছে। মাদারী খেলোয়াড় হরসুখ তার দুই বাঁদর নিয়ে এসেছে। বাঁদরেরা মানুষের সঙ্গেই ধান খুঁটছে।

ধানোয়ারের বাঁ পাশের ক্ষেতিতে রয়েছে লাখপতিয়া, ডান দিকের ক্ষেতিতে ফিতুলাল, তার জেনানা এবং বাচ্চারা। পেছনের জমিতে টহলরাম। এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে জমি-মালিকদের ফাঁকা ধানক্ষেতগুলোতে এখন ভুখা হাভাতেদের রাজত্ব চলছে।

দেখতে দেখতে দিগন্তের তলা থেকে পৌষ মাসের সূর্য উঠে আসে। শীতের নরম সোনালী রোদে বাকী কুয়াশা কেটে চারদিক ঝলমল করতে থাকে। তবু এখনও বড় জাড়। মাটি থেকে প্রচুর হিম উঠে আসছে।

রোদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক পরদেশী শুগা আর চোটা পাখি ক্ষেতিতে নেমে পড়েছে। ধানকাটানিরা যখন ফসল কেটেছে তখনও তারা ধান খেয়েছে। এখনও ঝাড়তিপড়তি ধানে ভাগ বসাচ্ছে। আর বেরিয়ে পড়েছে মেঠো ইঁদুর এবং সোনালী গোসাপেরা। ইঁদুরগুলো মাঠময় দৌড়ে বেড়ায় আর গোসাপেরা পেট টেনে টেনে আলের ওপর দিয়ে হাঁটে।

প্রতিটি ক্ষেতিতেই এখানে ওখানে মেঠো ইঁদুরের গর্ত। ইঁদুরেরা আগে থেকেই তার ভেতর ধান জমা করে রেখেছে।

দুই আঙুল দিয়ে শস্যকণা কুড়োতে কুড়োতে যখনই ধানোয়ারেরা একটা গর্ত পায়, সরু কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধান বার করে। এভাবে আগে থেকে গর্তের ভেতর ধান জমিয়ে রাখার জন্য মাঠ-কুড়ানিরা চিরকালই ইঁদুরের কাছে কৃতজ্ঞ।

ধান কুড়োতে কুড়োতে আচমকা পাশের জমি থেকে ধানোয়ারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে লাখপতিয়া, 'এ আদমী—'

ধানোয়ার মুখ তুলে তার দিকে তাকায়, 'কা ?'

'হুই দেখো—' আলের ওপর একটা বড় গোসাপকে দেখিয়ে লাখপতিয়া শুধোয়, 'অব কা করে ? গোয়টাকে (গোসাপটাকে) মারবে ?'

গোসাপের চামড়া ভাল দামে বিকোয়। ধানোয়ার বলে, 'আভি নায়। বহোত গোয় হ্যায় ইধরি। আগে ক'দিন ভাত খাই। তারপর গোয় মারব।'

আবার তারা ধান কুড়োতে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত একটানা খুঁটে খুঁটে ফসল তোলার পর কাচ্চীর ধারের গাছতলায় ফিরে কিছু খেয়েই আবার মাঠে নামে ধানোয়াররা। ফের ধান খোঁটা শুরু হয়।

তবে রোদ থাকতে থাকতেই আজ সবাই মাঠকুড়ানো থামিয়ে দেয়। কেননা যা ধান পাওয়া গেছে সেগুলোর খোসা ছাড়িয়ে চাল বার করতে সময় লাগবে। তারপর তো ভাত।

কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় ফিরে এসে একটা মুহূর্তও নষ্ট করে না ধানোয়াররা। কুড়ানো ধান চটের ভাঁজের মধ্যে রেখে গোড়ালি দিয়ে ডলে ডলে খোসা ছাড়াতে থাকে।

আশায় খুশিতে সবার চোখ চকচক করে। এদের মধ্যে লাখপতিয়ার বুড়ী শাশুড়ীর আনন্দ এবং উত্তেজনাটাই সব চাইতে বেশি। ভাঙাচোরা কোঁচকানো মুখে হাসি মাখিয়ে জড়ানো গলায় অনবরত বলতে থাকে, 'হো রামজী, কেত্তে রোজ পর গরমভাত্তা খেতে পাব!'

রামনৌসেরার জ্বরটা এ বেলা অনেক কম। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখে সে। মুখটা তার ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এত আদমী মাঠ কুড়িয়ে ধান এনেছে। শুধু সে বাদ। মনে মনে রামনৌসেরা

ভাবে, বুখারটা বাড়ুক বা কমুক, কোই পরোয়া নেই, কাল সে মাঠে নামবেই।

শুধু রামনৌসেরা নয়, আরো একজন ক্ষেতি থেকে ধান আনতে পারে নি। সে পঙ্গু দুবলা ছনেরি। করুণ মুখে চারদিকে তাকাতে তাকাতে ছনেরি চাপা শব্দ করে কাঁদতে থাকে আর বলে, 'লছমনটা বেঁচে থাকলে সে-ও ধান নিয়ে আসত।'

লছমন মরার পর হাভাতেরা সবাই নিজের নিজের খাদ্য থেকে একটু আধটু দিয়ে ছনেরিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু কেউ তাকে ভাতের ভাগ দেবে কিনা, ছনেরির সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এদিকে ধান থেকে চাল বার করা চলছেই। কিন্তু গোড়ালি দিয়ে ডলে ডলে এত ধানের খোসা ছাড়ানো অসম্ভব। অগত্যা সবাই নখ দিয়ে খুঁটতে শুরু করল।

চাল বার করতে করতে কখন যে সূরয পছিমা আকাশের তলায় নেমে গেছে, কখন চোখের সামনের দৃশ্যমান জগৎ আন্ধেরা আর কুয়াশায় একাকার হয়ে গেছে, আজ কেউ বুঝি টের পায় নি। তবে সন্ধের পর ঠাণ্ডাটা যখন জাঁকিয়ে নামছিল সেই সময় কে যেন 'ঘুরে'র আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

চাল বার করতে করতে বেশ রাত হয়ে যায়। সবাই ঝোলাঝুলি থেকে তোবড়ানো হাঁড়িটাড়ি বার করে পরম যত্নে নহর থেকে চাল ধুয়ে আনে। তারপর শক্ত মাটির ডেলা যোগাড় করে চুলা বানিয়ে কাঠকুটো জ্বেলে ভাত বসিয়ে দেয়।

কতকাল পর হাভাতেদের উনুন ধরে, নিজেরাই তা জানে না। চুলার আঁচে তাদের মুখগুলো বড় উজ্জ্বল দেখায়। হো কিষুণজী, কতদিন পর তারা ভাত খাবে।

কিছুক্ষণ পর টগবগ করে ভাত ফুটতে থাকে। নতুন চালের ভাতের কী প্রাণমাতানো সুগন্ধ! উত্তুরে হাওয়ায় সেই গন্ধ চরাচর জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

একসময় ভাত হয়ে যায়। কেউ আর ফেন ঝাড়ে না। তোবড়ানো সিলভারের থালায় গরম ভাত ঢেলে পুজোয় বসার মতো পবিত্র মন নিয়ে সবাই খেতে বসে।

ধানোয়ার ভাতের মধ্যে এক টুকরো মেটে আলু ফেলে দিয়েছিল। সেদ্ধ মেটে আলু নুন দিয়ে চটকে ভাতে মাখতে যাবে, সেই সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ে ছনেরি লুব্ধ চোখে এদিকেই তাকিয়ে আছে আর সমানে ঢোক গিলছে। কেউ তাকে একদানা ভাতও দেয়নি। দেবেই বা কেন? এত কষ্টের ভাত!

শুধু ছনেরিই না, রামনৌসেরাও এদিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই সে মাঠের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে নিজেকে ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার সময় হয় নি ধানোয়ারের। কিন্তু পঙ্গু কমজোরি মেয়েটার জন্য কষ্ট হতে থাকে তার। নিজের থালাটার দিকে একবার তাকায় সে। যা ভাত আছে তাতে একজনেরই হতে পারে।

ধানোয়ার নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ নয়। তবু এই মুহূর্তে কী যেন হয়ে যায় তার। থালাটা নিয়ে সোজা ছনেরির কাছে চলে আসে। বলে,' খা লে—'

প্রথমটা লজ্জায় জড়সড় হয়ে যায় ছনেরি। বলে, 'নায় নায়। এত্ত কষ্টের ভাত তোমার। তুমি খাও—'

ধানোয়ার ধমকে ওঠে, 'খা লে—'

দু-একবার আপত্তির পর খেতে শুরু করে ছনেরি। আর নিজের জায়গায় ফিরে এসে ঝোলা থেকে ক'টা ডাঁসা কুল বার করে চিবোতে থাকে ধানোয়ার। আর তখনই লাখপতিয়ার গলা ভেসে আসে। সে তার সাসকে বলছে, 'আর দুটো ভাত দেব?'

ধানোয়ার কুল চিবোতে চিবোতে ওদিকে মুখ ফেরায়।

লাখপতিয়ার বুড়ী শাশুড়ী লিকলিকে গলার ওপর মাথাটা নাড়তে নাড়তে বলে, 'দে—'

দেওয়ামাত্র মুহূর্তে খেয়ে ফেলে বুড়ী। লাখপতিয়া আবার শুধোয়, 'আর দেব?'

'দে—'

চোখের পাতা পড়তে না পড়তে ভাত শেষ হয়ে যায়।

লাখতিয়া বলে, 'আর দেব?'

'দে—'

এইভাবে লাখপতিয়া যত বার শুধোয়, কোন বারই 'না' বলে না বুড়ী। পেটের ভেতর দশটা জানবরের খিদে পুষে রেখেছিল যেন সে।

বুড়ীর খিদে যখন মেটে লাখপতিয়ার হাঁড়ি ফাঁকা হয়ে গেছে। নিজের জন্য এক দানা ভাতও আর পড়ে নেই। বুড়ী এতক্ষণ খাওয়ার ঝোঁকে ছিল। এবার আপসোসের গলায় বলে, 'এ বহু আমাকেই তো সব দিয়ে দিলি। তুই খাবি কী?'

উত্তর না দিয়ে লাখপতিয়া জিজ্ঞেস করে, 'তোর পেট ভরেছে?'

'আমার পেট তো ভরেছে। লেকেন তুহারকা পেটকা কা হোগা?'

'মকাই ভাজা আছে, খেয়ে নেব। সচমুচ তোর পেট ভরেছে তো?'

'সচমুচ।'

'কতকাল পর তোকে ভাত খাওয়াতে পারলাম। হো ভগোয়ান।'

'লেকেন—'

'লেকেন উকেন না। অব শো যা—'

এখন বেশ রাত হয়ে গেছে। থেকে থেকে রাতজাগা কামার পাখিরা মাথার ওপর চেঁচিয়ে উঠছে। অন্ধকার ফুঁড়ে ফুঁড়ে জোনাকিরা মাঠময় উড়ে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়া পৃথিবীর এই প্রান্তে পৌষের এই হিমার্ত রাতে আর কোন শব্দ নেই।

'ঘুরে'র চারপাশে অন্য দিনের মতো হাভাতের দল শুয়ে পড়েছে। তবে অন্য দিনের তুলনায় আজ কিছু তফাত আছে। আজ তাদের মুখেচোখে ভাত খাওয়ার অসীম তৃপ্তি। সবাই বলাবলি করছিল, এমন ভরপেট 'ভাত কা ভোজ' তিন চার মাসের মধ্যে তাদের এই প্রথম হল।

ধানোয়ারের শিয়রের দিকে মাথা দিয়ে আজ লাখপতিয়া শুয়েছে। ধানোয়ার নিজের থেকে লাখপতিয়াকে একবারই ডেকেছিল। আজ আবার ডাকল, 'এ আওরত—'

লাখপতিয়া তক্ষুনি সাড়া দেয়, 'কা ?'

'তোমার সব ভাত তো সাসকে খাইয়ে দিলে।'

'হাঁ। তোমার ভাতও তো ছনেরিকে খাইয়ে বসে কুল চিবোলে।'

'কা করে ? সবাই ভাত খাবে আর ছনেরিটা খাবে না ? ওর জন্যে বড় দুখ হচ্ছিল।'

লাখপতিয়া বলে, 'বুড়ী সাসটাকে কত রোজ ভাত দিতে পারি নি। ভাত ভাত করে একেবারে মরে যাচ্ছিল। খাইয়ে দিলাম।' একটু থেমে বলে, 'কাল ঠিক ভাত খাব।'

ধানোয়ার বলে, 'আমিও কাল ভাত খাব। এত দিন ভাত খাই নি। আর একটা দিন না খেলে আমরা মরে যাব না। কী বল ?'

'জরুর।'

'তবে কী জানো—'

'কী ?'

'নিজে না খেয়ে ছনেরিকে যে খাওয়ালাম সে জন্যে কষ্ট হচ্ছে না। ভালই লাগছে।'

'আমারও।'

'কাল সূরয উঠবার আগেই জমিনে নামব।'

'হাঁ—'

ওধারে কম্বলের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে গুনগুনিয়ে নৌটঙ্কীর গান গাইছে রামনৌসেরা :

আগে আগে গোরীয়া চলে, পিছেসে মিলনোয়া
মেলোয়া জালি রে ঝরেলিয়া···
গাগরী লেকে গৈলা ঘাট, ছেলা রোসে
দেহেলে বাট
সাঁচে সাঁচে কহিও গোরী আপনা বেয়নয়াঁ
তব ঐ হ্যাঁয় রে মিলনোয়া
মেলোয়া জালি রে ঝরেলিয়া—

গান শুনতে শুনতে ধানোয়ার লাখপতিয়ার দিকে একবার তাকায়। দু'জনে একটু হাসে। তারপর মাথার ওপর কম্বল টেনে দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকে। তাদের চারপাশে সফেদিয়া ফুলের মতো রাশি রাশি নতুন চালের ভাত টগবগ করে ফুটে চলেছে, আর ফুটন্ত ভাতের সুঘ্রাণে চরাচর ম ম করছে।